আ. পুশকিন

বেলকিনের গল্প

রুশ সাহিত্যের
শ্রেষ্ঠ
গ্রন্থাবলী

А. ПУШКИН

Повести Белкина

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА
1957

আ. পুশকিন

বেলকিনের গল্প

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো
১৯৫৭

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

চিত্রাঙ্কন: দ. আ. শ্মারিনোভ

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: স. ম. পজার্স্কি

সূচী

সম্পাদকের বক্তব্য	১৩
লক্ষ্যভেদ	২৩
তুষার ঝঞ্ঝা	৪৯
কাফনওয়ালা	৭৫
পোস্টমাস্টার	৯১
দুই কন্যা	১১৫
টীকা	১৪৯

আ. প.
সম্পাদিত
৺ইভান
পেত্রোভিচ
বেলকিনের
গল্প

সম্পাদকের

বক্তব্য

শ্রীমতী প্রস্তাকোভা:
আজ্ঞে হ্যাঁ, শৈশবকালেও ওর ঝোঁক ছিল গল্প শোনা।
স্কতিনিন:
মিত্রোফানের স্বভাব হয়েছে আমারই মতো।

'বয়স্ক নাবালক' [১]

ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের লেখা যে সব গল্প পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেল, তা প্রকাশ করার ভার পেয়ে আমাদের মনে হয়েছিল, লোকান্তরিত লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে মুখবন্ধ রচনা করলে ভালো হয়। আমাদের বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত জীবনী রুশ-সাহিত্য অনুরাগীদের বৈধ কৌতূহল কিয়দংশে পূর্ণ করবে। এই ভেবে আমরা ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের নিকটতম আত্মীয়া ও উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী মারিয়া আলেক্‌সেয়েভনা ত্রাফিলিনার কাছে অনুরোধ করে চিঠি পাঠাই। দুর্ভাগ্যবশত বেলকিন সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা গেল না, কেননা বেলকিনের সঙ্গে পরিচয় লাভের কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি। তবে তিনি পরামর্শ দেন যেন এ বিষয়ে আমরা বরং ইভান পেত্রোভিচের বন্ধুস্থানীয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে লিখি। এ পরামর্শ আমরা গ্রহণ করি। আমাদের চিঠির যে জবাব আসে তা বেশ সন্তোষজনক; উদার অনুভূতি ও আন্তরিক বন্ধুত্বের অমূল্য স্মারক হিসাবে চিঠিটিতে আমরা কোনো রকম রদবদল করিনি। জীবনী সংক্রান্ত বিবরণের কাজও এই থেকে বেশ চলে যাবে:

সবিনয় নিবেদন,

আমার এ যাবৎকালের অকৃত্রিম সুহৃদ ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিবেশী ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের জন্ম-মৃত্যু, তাঁহার কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, পেশা ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহের বাসনা প্রকাশ করিয়া, এ মাসের ১৫ই তারিখে আপনারা যে পত্র দিয়াছেন তাহা এই মাসের ২৩ তারিখে আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি আপনার অনুরোধ শিরোধার্য করার দায়িত্ব পাইয়া নিজের দিক হইতে অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি। উঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের যাহা কিছু আমার স্মরণে আছে, সে সমুদয় অত্রপত্রে আমার নিজস্ব কিছু কিছু মন্তব্য সহ প্রেরণ করিলাম।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে গরিয়ুখিনো গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের জন্ম হয়। তাঁহার ৺পিতৃদেব সেকেণ্ড্ মেজর পিওতর ইভানোভিচ বেলকিন ত্রাফিলিন-পরিবারের আইবুড়ী কন্যা পেলাগেয়া গাভ্রিলোভনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক ধনী না হইলেও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং নিজ বিষয়-কার্য পরিচালনার দক্ষতা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় গীর্জার মুনসীর নিকট। এই গুণ। লোকটির জন্যই বোধ হয় বেলকিনের পড়াশুনার আগ্রহ ও মাতৃভাষায় রচনার শখ জন্মে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেলকিন জারের একটি পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন—বাহিনীটির নম্বর আমার স্মরণে নাই। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাহিনীতে ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা একের পর এক উভয়েই ইহধাম ত্যাগ করায় বেলকিন কাজে ইস্তফা দিয়া জন্মস্থান গরিয়ুখিনো গ্রামে পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি লইয়া বসবাস করিতে থাকেন।

মহাল তদারক করিতে শুরু করিয়া অনভিজ্ঞতা এবং কোমলহৃদয় বশত ইভান পেত্রোভিচের বিষয়-আশয় নিতান্ত অবহেলার মধ্যে গিয়া পড়ে, পৈতৃক আম্‌লের কঠোর শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া যায়। মহালের কৃষক প্রজারা তাঁহার প্রধান মণ্ডলকে পছন্দ করিত না (প্রজাদের স্বভাবই তাই), এই কারণে তিনি ঐ সুবিবেকী লোকটিকে পদচ্যুত করিয়া গ্রাম-মহালের তদারকের ভার ছাড়িয়া দেন তাঁহার বাড়ির বৃদ্ধা দাসীর উপর। মেয়েটি ভালো গল্প করিতে পারিত এই দেখিয়া তিনি উহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ও বুড়িকে ঠকানো ছিল খুবই সহজ—কোন্‌টা পঁচিশ-রুবল নোট কোন্‌টাই-বা পঞ্চাশ রুবল, উহাও সে কখনো চিনিয়া উঠিতে পারিত না। কৃষক প্রজাদের অনেকের ছেলের সে ছিল আবার ধর্ম-মা। তাই উহাকে কোনো প্রজাই ভয় করিত না। তাহারা নূতন এক মণ্ডল স্থির করিল—লোকটি তাহাদের যৎপরোনাস্তি লাই দিত, কৃষকদের সহিত সাঁট করিয়া জানিয়া শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিত এবং মনিবকে ঠকাইত। ইভান পেত্রোভিচকে ভাগচাষ ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইল। উহার পরিবর্তে ভয়ানক কম হারে তিনি কেবল খাজনার প্রবর্তন করিলেন। তৎসত্ত্বেও মনিবের দুর্বলতার সুযোগে কৃষকেরা প্রথম বৎসরের জন্য বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিয়া লইল, এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে খাজনার দশ আনারও বেশি পরিমাণ অংশ কাটান দিল কেবল বাদাম, বিলবেরি প্রভৃতি ফলপাতি বাবদ এবং এমনকি তাহাতেও বকেয়া খাজনা রহিয়া গেল।

ইভান পেত্রোভিচের স্বর্গত পিতৃদেবের বন্ধু হিসাবে পুত্রকেও সৎপরামর্শ দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, ছেলেটির নিজের মুরোদে তো আর

কুলাইবে না তাই সাবেকী আমলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার জন্যে আমিই উপযাচক হইয়া বারংবার প্রস্তাব করি। এই উদ্দেশ্যে একদিন আমি বেলকিনের কাছে গেলাম। হিসাব-পাতি খাতাপত্র সব দেখিতে চাহিলাম। হারামজাদা মণ্ডলটাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইভান পেত্রোভিচের সমক্ষেই সে সমুদয় পরীক্ষা করা শুরু করিলাম। নবীন জমিদার প্রথম প্রথম সাতিশয় মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে আমার তদারকী দেখিতেছিলেন; কিন্তু হিসাবপত্র হইতে যেই দেখা গেল যে আগের দুই বৎসরে কৃষক পরিবারগুলিতে লোক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু হাঁস মুরগী গরু বাছুর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়াছে অমনি ইভান পেত্রোভিচ আর কিছুই শুনিতে রাজী হইলেন না। হারামজাদা মণ্ডলটাকে আমি জবরদস্ত রকমের জেরা করিয়া ও তদারক চালাইয়া বেসামাল করিয়া আনিয়াছিলাম, উহার পক্ষে আর টুঁ শব্দটি করিবার জো ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল ইভান পেত্রোভিচ তাঁহার চেয়ারে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে শুরু করিয়াছেন। ইহাতে আমি যে কিরূপ অপ্রতিভ হই তাহা কি বলিব। সেই মুহূর্ত হইতে আমি উঁহার সম্পত্তির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করায় ক্ষান্তি দিয়া সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপর তাহা ছাড়িয়া দিই (উনি নিজেও তাহাই করিয়াছিলেন)।

এই সব ঘটনা ঘটিলেও কিন্তু আমাদের মধ্যেকার সৌহার্দ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ আমাদের যুবাবয়স্ক ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে প্রায়শই যে ধরণের সর্বনাশা শৈথিল্য দেখা যায়, ইভান পেত্রোভিচের মধ্যেও তাহা দেখিয়া আক্ষেপ বোধ করিলেও তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। এরূপ সহৃদয় ও মর্যাদাবান যুবাপুরুষের প্রতি প্রীতি অনুভব না করিয়া পারা

যায় না। ইভান পেত্রোভিচ নিজেও আমার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং আমার প্রাচীন বয়সের জন্যে যোগ্য সম্মান দেখাইতেন। শেষদিন পর্যন্ত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ছিল প্রায় দৈনন্দিন। আহার বিহার, ভাবনাচিন্তা ও স্বভাব চরিত্রের দিক হইতে আমাদের মিল যৎকিঞ্চিৎ হইলেও আমার সহজ আলাপ তিনি পছন্দ করিতেন।

রুচির দিক হইতে ইভান পেত্রোভিচ ছিলেন অত্যন্ত মধ্যম প্রকৃতির—কোনো প্রকার আতিশয্যের মধ্যে তিনি যাইতেন না। মদ্যপান করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহাকে আমি দেখি নাই। (আমাদের অঞ্চলের পক্ষে ইহা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয়।) নারী সম্পর্কে তাঁহার বেশ দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন কুমারীর মতো লাজুক।*

পত্রে যে সমুদয় গল্পের কথা আপনারা লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরো অনেক পাণ্ডুলিপি ইভান পেত্রোভিচ রাখিয়া গিয়াছেন। উহার কতকগুলি আমার নিকট আছে। বাকিগুলিকে বাড়ির দাসী সংসারের নানা কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। যেমন, গতবৎসর শীতকালে, বাড়ির যে অংশে দাসী ছিলেন, তথাকার যাবতীয় বাতায়নের উপর তিনি ইভান্ পেত্রোভিচের অসমাপ্ত একটি উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া আঠা দিয়া সাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আপনাদিগের উল্লিখিত গল্পগুলি তাঁহার প্রথম

---

* এর পরে একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল, বাহুল্য বোধে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাঠকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাতে ইভান পেত্রোভিচের স্মৃতির প্রতি হানিকর কিছু ছিল না।

সাহিত্য-প্রচেষ্টা বলিয়া আমার ধারণা। ইভান পেত্রোভিচ বলিতেন উহার অধিকাংশই সত্য ঘটনা, নানা লোকের নিকট হইতে তিনি সেগুলি শুনিয়াছিলেন।* চরিত্রের নামগুলি কাল্পনিক, যদিও গ্রাম ও বসতগুলি সবই এই অঞ্চলের, উহার মধ্যে আমার নিজের গ্রামটির কথাও রহিয়াছে। কোনোরূপ দুরভিসন্ধিবশত যে তিনি এরূপ করিয়াছেন তাহা নয়, বরং ইহার পিছনে তাঁহার কল্পনার অভাবই কাজ করিয়াছে।

১৮২৮ সালের শরৎকালে ইভান পেত্রোভিচের গুরুতর ঠাণ্ডা লাগে এবং তাহা হইতে সাংঘাতিক জ্বর দেখা দেয়। স্থানীয় যে বৈদ্যটি ছিলেন, পায়ের কড়া প্রভৃতি পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসায় তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্বেও কিন্তু ইভান পেত্রোভিচকে বাঁচানো গেল না। ঠিক ত্রিশ বৎসর বয়সে ইভান পেত্রোভিচ আমার ক্রোড়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

---

* বস্তুত ই. প. বেলকিনের পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটা গল্পের ওপরেই লেখক স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন অমুকের কাছ থেকে শোনা; কার কাছ থেকে শোনা তা বোঝাবার জন্য তার পেশা বা খেতাব এবং নামের আদ্যক্ষর দেওয়া ছিল। উৎসুক পাঠকদের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে ‘পোস্ট-মাস্টার’ গল্পটি তাঁকে বলেছিলেন খেতাবী কাউন্সেলার আ. গ. ন.; ‘লক্ষ্যভেদ’ গল্পটি বলেছিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ই. ল. প.। ‘কাফনওয়ালা’ গল্পটি বলেছিলেন একজন দোকান কর্মচারী ব. ভ.। ‘তুষার-ঝঞ্ঝা’ আর ‘দুই কন্যা’ গল্প দুটি শুনেছিলেন একজন তরুণী মহিলা ক. ই. ত’র কাছ থেকে।

করিলেন, গোরিয়ুখিনো গ্রামের গীর্জা প্রাঙ্গণে আপন পিতামাতার সমাধির পাশেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

ইভান পেত্রোভিচ ছিলেন মধ্যম দৈর্ঘ্যের লোক, চক্ষু ধূসর বর্ণের, কটা চুল, টিকল নাক, ফরসা মুখ এবং পাতলা ধাঁচের গাত্রবর্ণ।

আমার লোকান্তরিত সুহৃদ ও প্রতিবেশীর জীবনকাহিনী; কাজকর্ম, শখ এবং চেহারা সম্পর্কে এইটুকুই আমার স্মরণ হইতেছে। যদি এ পত্র আপনারা ব্যবহার করা মনস্থ করেন তবে অনুরোধ, দয়া করিয়া আমার নামটি উল্লেখ করিবেন না। কারণ সাহিত্য জগতের ব্যক্তিবর্গের প্রতি সাতিশয় মর্যাদা ও প্রীতি বোধ করিলেও, স্বয়ং সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার বাসনা আমার নাই। বস্তুতপক্ষে আমার যাহা বয়স তাহাতে উহা মানাইবে না।

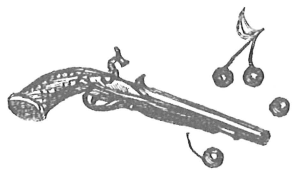
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে, ইতি…।

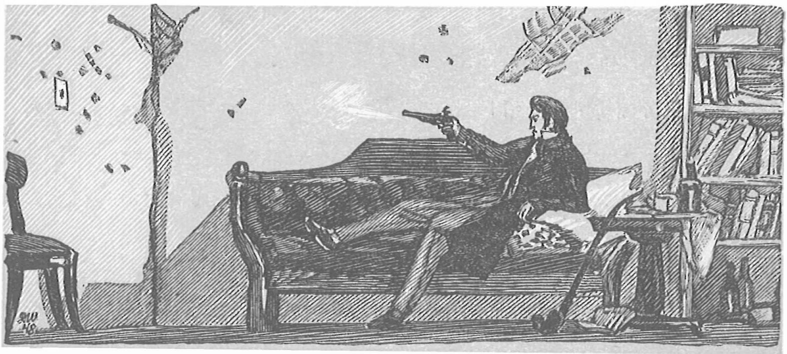
১৬ই নভেম্বর ১৮৩০,
নেনারাদভো গ্রাম

লেখকের সুহৃদ যে অনুরোধ করেছেন তা পালন করা আমাদের কর্তব্য বলে ভেবেছি। যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আশা করি এ চিঠির অকৃত্রিম ও সরল মনোভাবটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

আ. প.

লক্ষ্যভেদ





আমরা একটা ডুয়েল লড়লাম।

বারাতিন্‌স্কি [২]

কসম নিয়েছিলাম, ডুয়েলের কানুন মাফিক গুলি করে ওকে
আমি মারব (একটা মার আমার এখনো পাওনা আছে)।

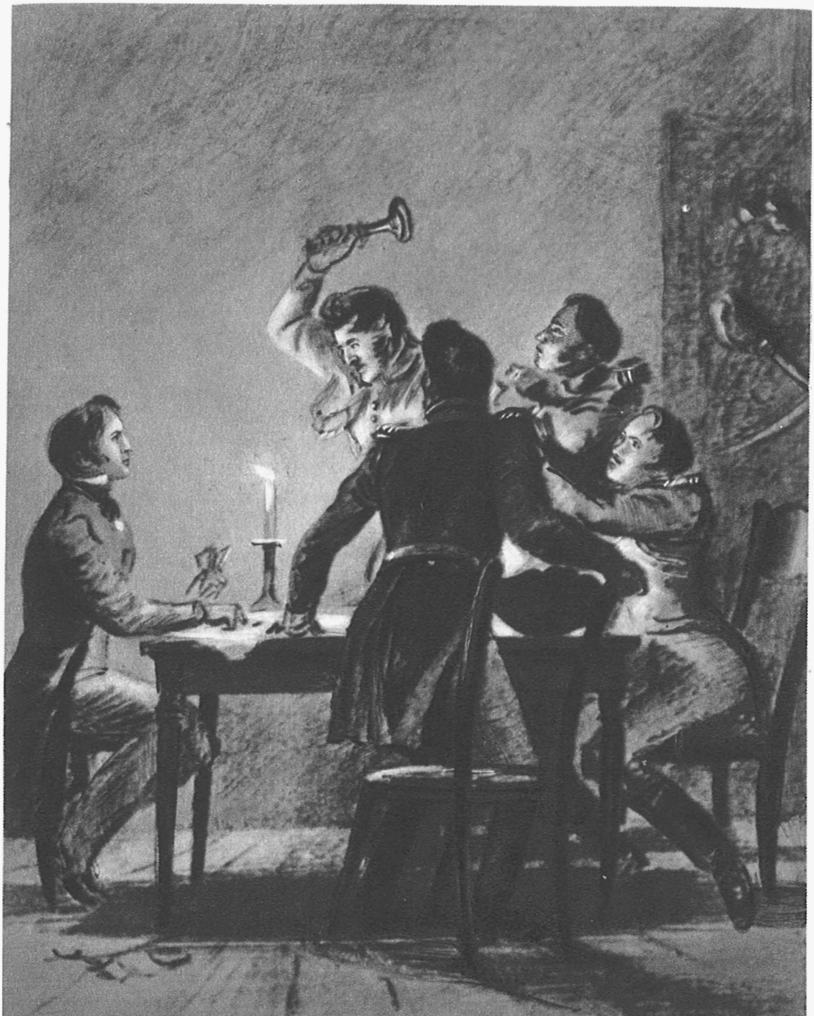
'পথচলতি আস্তানায় এক সন্ধ্যা' [৩]

১

ছোট একটা শহর 'ক'। সেখানে আমাদের ছাউনি পড়েছিল। সকলেই জানেন সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসারের জীবনযাত্রাটা কেমন। সকালে ড্রিল আর ঘোড়-দৌড়ের ক্লাস, তারপর রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের বাড়িতে, নয়ত কোনো একটা ইহুদি সরাইখানায় ডিনারের ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় মদ আর তাসের আড্ডা। 'ক' শহরের একটা বাড়িরও দরজা আমাদের জন্যে খোলা ছিল না। বিয়ের যুগ্যি বয়স হয়েছে এমন মেয়েও পাওয়া যেত না একটিও।

তাই এক-একবার এক-একজনের কোয়ার্টারে গিয়ে আমরা জুটতাম। আর সেখানে পরস্পরের ইউনিফর্মের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া করার কিছুই আমাদের থাকত না।

আমাদের দলের মধ্যে শুধু একজন ছিল যে সৈন্যদলের লোক নয়। বয়স তার প্রায় পঁয়ত্রিশ—আমরা তো তাকে প্রায় প্রৌঢ় বলেই ধরে নিয়েছিলাম। আমাদের তুলনায় ওর একটা মস্ত প্রাধান্য ছিল অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া লোকটার স্বাভাবিক গোমড়া মুখ, বদমেজাজী স্বভাব আর কড়া-কড়া কথাবার্তার একটা তীব্র প্রভাব আমাদের কাঁচা মনের ওপর বেশ ছাপ ফেলেছিল। লোকটার অতীত ছিল রহস্যে ঢাকা। দেখে মনে হত লোকটা বুঝি রাশিয়ান, কিন্তু নামটা ছিল আবার বিদেশী বিদেশী। একসময় সে নাকি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে কাজ করত—উন্নতি করার সমূহ সম্ভাবনা তার সেখানে ছিল। তা সত্ত্বেও কেন যে সে ঘোড়সওয়ার বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে এই একটা হতচ্ছাড়া ক্ষুদে শহরে এসে ডেরা বাঁধল কেউ জানত না। দিন কাটাত সে একই সঙ্গে কৃপণের মতো, আবার দিল্‌দরিয়ারও মতো। ঘোরাঘুরি করার বেলায় যেত পায়ে হেঁটে, পোশাক বলতে ছিল একটা পুরনো কালো ফ্রক-কোট, কিন্তু আমাদের রেজিমেণ্টের সমস্ত অফিসারের জন্যেই তার বাড়িতে আতিথ্য ছিল অবারিত। একথা অবিশ্যি ঠিক যে ডিনারে পদ থাকত মাত্র দুটি কি তিনটি—আর তা রান্না করত একটা প্রাক্তন সেপাই। অথচ টেবিলে কিন্তু শ্যাম্পেনের স্রোত বইত অফুরন্ত। কি তার আয়, কি বা তার সম্পত্তি এসব কথা কেউ জানত না, জিজ্ঞেস করতেও সাহস হত না। লোকটার বই ছিল প্রচুর, তার বেশির ভাগই সামরিক পাঠ্যপুস্তক আর উপন্যাস। চাইলেই



সে তা পড়তে দিত এবং কখনো ফেরত চাইত না। নিজেও সে কখনো বই ধার নিলে তা আর মালিককে ফেরত দিতে যেত না। কাজের মধ্যে তার কাজ ছিল কেবল পিস্তল চালানো। ওর ঘরের দেয়ালগুলো সব ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটের গর্তে, মনে হত যেন এক একটি মৌচাক। দরিদ্র যে কুঁড়েতে তার ডেরা ছিল সেখানে ধনসম্পদ বলতে ছিল শুধু একরাশ দামী দামী পিস্তল। লক্ষ্যভেদে হাত ছিল তার খুব উঁচু দরের। সে যদি বলত, এসো মাথার টুপির ওপর পিয়ার ফল রেখে দাঁড়াও, ফল তাক করে গুলি চালাবো, তাহলে মাথা পেতে দিতে ভয় করবে এমন একটা লোকও আমাদের রেজিমেণ্টে পাওয়া যেত না। আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে প্রায়ই উঠত ডুয়েল লড়ার কথা। অথচ সিলভিও (লোকটাকে এই নামেই চালানো যাক) কখনো তাতে যোগ দেয়নি। যদি জিজ্ঞেস করা যেত সে ডুয়েল লড়েছে কিনা তাহলে রূঢ়ভাবে একটা 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া আর কোনো কথায় সে যেত না। বোঝা যেত এরকম প্রশ্ন তার পছন্দসই নয়। আমরা ধরে নিয়েছিলাম হয়ত তার মারাত্মক নিশানার কবলে প্রাণ দিয়েছে এমন কারো স্মৃতি তার বিবেকে বিঁধে আছে। ঘুণাক্ষরেও আমরা ভাবতে পারিনি যে তার মধ্যে কোনো রকম ভীরুতা সম্ভব। কিছু লোক আছে যাদের মুখ দেখেই বলা যায় তা অসম্ভব। কিন্তু পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমরা সকলেই ভারি অবাক হয়ে গেলাম।

সিলভিওর বাড়িতে একদিন আমরা জনদশবারো অফিসার ডিনারে বসেছি। মদ্যপানও করা গিয়েছিল ঠিক অন্যান্য দিনের মতোই, অর্থাৎ বেশ প্রচুর পরিমাণে। ডিনারের পর গৃহস্বামীকে অনুরোধ করলাম, তাস খেলায়

সে ব্যাঙ্কের কাজ করুক। সিলভিওকে অনেকক্ষণ ধরেও রাজী করান গেল না—তাস সে খুব কমই খেলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেদিন সে তাস আনতে বললে, টেবিলের ওপর গোটা পঞ্চাশেক দশ রুবল ছড়িয়ে দিয়ে তাস বাঁটা শুরু করল। আমরাও তাকে ঘিরে বসলাম, শুরু হল খেলা। খেলার সময় একেবারে চুপ করে থাকাই ছিল সিলভিওর ধাত, তর্কও করত না, সাফাইও গাইত না। বাজীদার খেলু যদি কোনো ভুল করত তাহলে সিলভিও হয় তৎক্ষণাৎ দান শোধ করে দিত নয়তো বকেয়া হিসাব টুকে রাখত। এসব ব্যাপার আমাদের সকলেরই জানা ছিল—সিলভিওর নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে চলতে আমরা আপত্তি করতাম না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেদিন অন্য রেজিমেণ্ট থেকে সদ্য বদলী একজন ছিলেন। খেলতে খেলতে লোকটা অন্যমনস্কভাবে বাজীর পরিমাণ এক পয়েণ্ট বাড়িয়ে দিলে। সিলভিও তার অভ্যাস মাফিক একটা চকখড়ি তুলে নিয়ে আঁকটা ঠিক করে দিল। অফিসারটি ভাবলে বোধ হয় সিলভিওর ভুল হয়েছে, তাই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলে। কিন্তু সিলভিও কর্ণপাত না করে নীরবে খেলেই চলল। ধৈর্য হারিয়ে অফিসারটি বুরুশ দিয়ে স্কোর বোর্ড থেকে লেখাটা মুছে দিলে। সিলভিও চক নিয়ে সংখ্যাটা আবার লিখে দিলে নতুন করে। মদ আর জুয়ায় আর সঙ্গীদের হাসির প্রভাবে অফিসারটি সহসা উত্তেজিত হয়ে ভাবলে তাকে অপমান করা হয়েছে। টেবিল থেকে পেতলের একটা মোমদানি তুলে সে ছুঁড়ে মারলে সিলভিওর দিকে। অল্পের জন্যে সিলভিও বেঁচে গেল। কিন্তু আমাদের অস্বস্তির সীমা রইল না। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে সিলভিও উঠে দাঁড়াল। চোখ তার তখন জ্বলছে। বললে, 'আপনার কপাল ভালো যে এ

ঘটনা আর কোথাও না হয়ে আমার বাড়িতেই ঘটল। দয়া করে এবার পথ দেখুন।'

এর পরিণতি যে কোথায় গড়াবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র ছিল না, ধরে নিয়েছিলাম আমাদের নতুন সঙ্গীটির দফা শেষ। লোকটা যাবার সময় বলে গেল, ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকটি যখনই বলবেন, তখনই এ অপমানের জবাব দিতে সেও প্রস্তুত। খেলা আরো কিছুক্ষণ চলল বটে, কিন্তু সকলেই আমরা টের পাচ্ছিলাম, গৃহস্বামী আর তাসে মন দিতে পারছেন না। সুতরাং একে একে বিদায় নিয়ে আমরা যে যার কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিলাম। শীগগিরই যে এবার ওকে খসতে হচ্ছে তাই নিয়ে আলাপ চলল যেতে যেতে।

পরদিন ঘোড়দৌড়ের ক্লাসে আমরা বলাবলি করছি বেচারা লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট এখনো বেঁচে আছে কিনা, এমন সময় লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট নিজেই এসে হাজির। সেই কথা ওকেও জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, সিলভিও এখনো তাকে কিছু জানায়নি। ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল। সিলভিওর বাড়িতে গিয়ে আমরা হানা দিলাম। দেখি ফটকের ওপর একটা টেক্কা বসিয়ে সে তাসটার ঠিক মধ্যিখানে গুলি করে চলেছে একটার পর একটা। আগের দিনের ঘটনাটার কথা মোটেই না তুলে সে ঠিক তার অভ্যেস মতোই আমাদের আমন্ত্রণ জানালো। এই ভাবেই তিনদিন কেটে গেল এবং লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট বেঁচেই রইলেন। অবাক হয়ে আমরা বলাবলি করলাম, সিলভিও লড়তে চাইছে না, একি সম্ভব? কিন্তু সত্যিই সিলভিও লড়ল না। লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্টের কাছ থেকে সামান্য একটু ক্ষমা প্রার্থনা আদায় করেই সে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে।

জোয়ানদের কাছে এতে বোধ হয় সিলভিওর মর্যাদা অনেকটা খাটো হয়ে গিয়েছিল। সাহসের অভাব বস্তুটা তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ গুণ তাদের কাছে হল নির্ভীকতা, হাজার পাপও তাতে ঢাকা পড়ে যাবে। ক্রমে অবশ্য লোকে ব্যাপারটা ভুলে যায় এবং সিলভিও তার আগের প্রতিষ্ঠা আবার ফিরে পায়।

শুধু আমি কখনো ওরকম করে ভাবতে পারিনি। রোমান্টিক কল্পনার দিকে আমার স্বভাবতই একটা ঝোঁক আছে। লোকটার জীবন খানিকটা প্রহেলিকার মতো বলে ইতিপূর্বে আমি ছিলাম তার সবচেয়ে বড়ো ভক্ত —ভেবে রেখেছিলাম লোকটা নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় কাহিনীর নায়ক। তার দিক থেকেও আমার জন্যে একটা টান ছিল। অন্তত আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় তার যা অভ্যাস সেরকম ব্যঙ্গাত্মক ভাষা বিশেষ প্রয়োগ করত না, নানা বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করত বেশ স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সেদিনকার ওই দুর্ভাগ্য সন্ধ্যাটার কথা আমি কিছুতেই আর ভুলতে পারলাম না, লোকটা ইচ্ছে করেই তার মর্যাদা কলঙ্কমুক্ত করলে না এ কথা মনে থাকায় আমি তার কাছে আর কখনো স্বাভাবিক হতে পারিনি। তার চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা হত। সিলভিও এটা নজর করেছিল এবং তার কারণও আন্দাজ করেছিল, কেননা বোকা সে নয়, অভিজ্ঞতাও কম নয় তার। বোধ হয় এতে ওর কষ্ট হত। অন্তত একবার কি দুবার আমি বেশ টের পেয়েছিলাম সে কথা কইবার জন্য উষখুষ করছে। কিন্তু সে সুযোগ আমি তাকে দিইনি। আমার অনিচ্ছা দেখে সিলভিও তারপর আর কিছু বলেনি। এবং তারপর থেকে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র হয়ে ছাড়া কখনো সিলভিওর

সঙ্গে দেখা করিনি। আগে আমাদের দুজনের মধ্যে যে ধরণের অকপট আলাপ চলত তা বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রাম বা মফস্বল শহরের বাসিন্দাদের কাছে এমন কতকগুলি উত্তেজনার খোরাক আছে যা বড়ো-বড়ো নগরের শহুরে দুলালদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। যেমন ধরা যাক চিঠি বিলির দিনটার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকা। মঙ্গলবার আর শুক্রবার—এই দুই দিন রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার ভরে যেত অফিসারে—কারো টাকা আসবে, কারো চিঠি, কারো বা সংবাদপত্র। চিঠি আসামাত্র তৎক্ষণাৎ তা ওখানেই খুলে পড়া হত, খবরাখবর যা কিছু সব তক্ষুনি পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া হত। অফিস এলাকাটা ভরে উঠত বিপুল চঞ্চলতায়। সিলভিও এখানে প্রায়ই আসত কারণ তার ডাকও বিলি হত আমাদের রেজিমেণ্ট মারফত। সেদিন একটা চিঠি পাওয়ামাত্র অধৈর্যের মতো সে তার সীলটা ছিঁড়লে। চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। অফিসারেরা সবাই নিজের নিজের চিঠিতে ডুবে ছিল—ওর দিকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ শোনা গেল সিলভিও চিৎকার করে বলছে, 'অফিসারমশাইরা শুনুন, অবস্থাগতিকে অবিলম্বে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে। তাই আজ শেষবারের মতো আমার ওখানে ডিনারে যেতে আপনারা যেন না করবেন না এই অনুরোধ।' আমার দিকে চেয়ে সে বললে, 'তোমাকে আসতেই হবে কিন্তু'। এই বলে সে দ্রুত হেডকোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেল। আমরাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যে যার পথ ধরলাম।

যথাসময়ে সিলভিওর বাড়ি গিয়ে দেখা গেল প্রায় গোটা রেজিমেণ্টটাই এসে হাজির হয়েছে। জিনিসপত্র সব ইতিমধ্যেই বাঁধাছাঁদা সারা। নিঃসঙ্গ

বুলেট-বেঁধা দেয়ালটা ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই। টেবিলে খেতে বসা গেল। গৃহস্বামীর মনে সেদিন ফুর্তি আর ধরছিল না। অতিথিদের মধ্যেও সে ফুর্তি সংক্রামিত হতে দেরি হল না। সশব্দে বোতলের ছিপি খোলা হতে লাগল অনবরত, ফেনিয়ে উঠল মদ, হিসহিস শব্দ উঠতে থাকল গেলাসে গেলাসে আর বিদায়ী বন্ধুটির জন্য চরম সৌভাগ্য আর শুভযাত্রার কামনা জ্ঞাপনে আমরা বিরাম মানছিলাম না। টেবিল ছেড়ে যখন ওঠা গেল তখন বেশ রাত হয়েছে। যে যার টুপি নিয়ে বেরুবার সময় সিলভিও এক এক করে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলে। আমি চলে যাচ্ছিলাম, সিলভিও হাত ধরে আমায় থামালে। মৃদুস্বরে সে বললে, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে'। আমি থেকে গেলাম।

অতিথিরা চলে গিয়েছিল। আছি শুধু আমরা দুজন। পরস্পরের মুখোমুখি বসে আমরা পাইপ ধরাতে লাগলাম নিঃশব্দে। সিলভিও কী যেন ভাবছিল—অল্প আগের দমকা ফুর্তির একটু ছিটেও যেন আর ওর মধ্যে নেই। থম্‌থমে চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, মুখ থেকে কড়া ধোঁয়া বেরুচ্ছে—সব মিলিয়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আস্ত একটা দানব। কয়েক মিনিট এইভাবে কাটার পর সিলভিও স্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'বোধ হয় আমাদের আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। বিদায় নেবার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা কয়ে যেতে চাই। তুমি বুঝতে পারো অন্যে আমার সম্পর্কে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে তুমি থাকবে একথা ভেবে আমার কষ্ট হবে।'

একটু থেমে সিলভিও তার পাইপের খোল ভর্তি করতে শুরু করলে। কথা না বলে আমি চেয়ে রইলাম মাটির দিকে।

ও আবার বলতে লাগল, 'তোমার হয়ত আশ্চর্য ঠেকেছে, ঐ মাতাল লক্কা 'র'-এর সঙ্গে কেন আমি লড়লাম না। এক্ষেত্রে হাতিয়ার বেছে নেবার অধিকার ছিল আমারই। সুতরাং নিশ্চয়ই মানবে যে লোকটার জান ছিল আমারই হাতে। আমার নিজের জীবনের দিক থেকে ভয়ের বেশি কিছু ছিল না। তবু যে আমি নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলাম সেটা আমার উদারতারই দরুণ—এরকম একটা ধারণা তুমি অনায়াসে করতে পারতে। কিন্তু তোমায় ঠকাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আসলে, আমার জীবন মোটেই বিপন্ন হচ্ছে না এই যদি হত, তবে কখনোই আমি লোকটাকে ক্ষমা করতাম না।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম সিলভিওর দিকে। তার মুখে স্বীকারোক্তি শুনে আমি একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

সিলভিও বলে চলল, 'হাঁ, আমার জীবন বিপন্ন করার কোনো অধিকার আমার নেই। ছয় বছর আগে আমার মুখের ওপর একজন থাপ্পড় মেরেছিল। আর আমার সে শত্রু এখনো বেঁচে।'

আমার কৌতূহলের সীমা পরিসীমা ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, 'লড়লে না তার সঙ্গে? ঘটনাচক্রে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে হয়েছিল বুঝি?'

সিলভিও বললে, 'লড়েছিলাম বৈকি। আমাদের ডুয়েলের একটা স্মৃতিচিহ্নও আমার আছে।'

সিলভিও উঠে গিয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বার করলে একটা পাট করা লাল টুপি—তার সঙ্গে গিল্টি করা একটা ঝুঁটি লাগানো,

(ফরাসীরা যাকে বলে পুলিসী ফেজ) সেই রকম। সিলভিও টুপিটা মাথায় দিতেই দেখা গেল কপালের ইঞ্চিখানেক ওপরে তাতে বুলেটের একটা ছ্যাঁদা।

সিলভিও বলে গেল, 'তুমি জানো, আমি একসময় "ন"-নম্বর ঘোড়সওয়ার দলে কাজ করতাম। আমার স্বভাব কি-রকমের তাও তোমার জানা। সব কিছুতেই পয়লা নম্বরের—এই হল আমার অভ্যাস। আর জোয়ান বয়সে সেই-ই ছিল আমার একমাত্র ধ্যান। আমাদের কালে হৈ-হাঙ্গামা করতে পারাই ছিল ফ্যাশান। আর আমাদের বাহিনীতে আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেপরোয়া। মাতাল হতে পারা ছিল একটা গর্বের ব্যাপার। কবি দেনিস দাভিদভ [৪] যাঁকে অমর করে গেছেন সেই বিখ্যাত বুর্তসোভের চেয়েও আমি একবার আরও অনেক বেশী মদ টেনেছিলাম। ডুয়েল লড়া হত মিনিটে-মিনিটে, আর তাতে আমি লড়ছি না কিংবা দোসর লড়িয়ে হিসেবে দাঁড়াচ্ছি না—এমন ডুয়েল প্রায় খুঁজেই পাওয়া যেত না। সঙ্গীরা আমাকে প্রায় পূজো করতে শুরু করেছিল আর রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার যারা সব হরদম বদলী হয়ে আসত তাদের চোখে আমি ছিলাম একটা অপরিহার্য অভিশাপ বিশেষ।

বেশ নিশ্চিন্তে (কিংবা তেমন নিশ্চিন্তে বোধ হয় নয়!) আমি আমার নাম ডাক উপভোগ করছি এই সময় বড়োলোকের এক পোলা এসে আমাদের রেজিমেণ্টে ভর্তি হয়। লোকটা খুবই একটা নামজাদা বংশের ছেলে, তার নাম আমি বলব না। এমন চোখ-ধাঁধাঁনো একটা লোক আর ভাগ্যের এমন বরপুত্র আমি আর কোথাও দেখিনি! যৌবন, বুদ্ধি, রূপ, হুল্লোড়ে মেজাজ,

অসম সাহস, নামজাদা বংশ আর অফুরন্ত টাকা—দুহাতে খরচ করেও যা বোধ হয় শেষ হবে না—এই সব কটি একত্রে কল্পনা করে দেখো, তাহলে বুঝবে আমাদের ওপর কি রকম প্রভাব সে ফেলেছিল। চ্যাম্পিয়ান হিসাবে যশ আমার গেল টলে। আমার নাম-ডাক শুনে সে প্রথম দিকে আমার সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছিল। কিন্তু আমি গরজ না দেখানতে সেও এতটুকু আপশোস না করে ছাড়ান দেয়। লোকটার ওপর আমার একটা জাতক্রোধ জন্মে গিয়েছিল। রেজিমেণ্টের কাছে আর মহিলাদের কাছে ওর খাতির দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কি করে ওর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাই এই ছিল আমার চেষ্টা—কিন্তু আমি যেসব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতাম ও তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাবে তা এমন ভাবে কাটান দিত যে প্রত্যেকবারই আমার মনে হত ওর প্রত্যুক্তিগুলো সব আমার চেয়েও অনেক বেশি সতেজ, আর সরস মজাদার। আমার কথায় থাকত বিষ, ওর কথায় থাকত রহস্য। একদিন এক পোলিশ জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার একটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার চলছিল। বলনাচের সময় দেখলাম, লোকটা যেন উপস্থিত সমস্ত মেয়েদের কাছেই, বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীর একেবারে চোখের মণি হয়ে উঠেছে। ব্যাপার দেখে আমি লোকটার কানে কিছু অশ্লীল ইয়ার্কি ছাড়ি। ও লাল হয়ে উঠে ধাঁ করে আমার মুখের ওপর একটা থাপ্পড় মেরে বসে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই আমরা তরোয়ালের হাতল চেপে ধরলাম। মেয়েদের মধ্যে মূর্ছা যাওয়া শুরু হয়ে গেল। জোর করে আমাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হল। সেই রাত্রেই ডুয়েল লড়ব বলে আমরা চলে গেলাম।

তখন ভোর হয় হয়। তিনজন দোসর সঙ্গে নিয়ে আমি যথাস্থানে

গিয়ে দাঁড়ালাম। শত্রুর প্রতীক্ষা করতে গিয়ে আমার ধৈর্য আর বাঁধ মানছিল না। সময়টা ছিল বসন্তকাল। সূর্য উঠল আগেই। চারদিক বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় দূরে দেখা গেল ও হেঁটে আসছে। গায়ের সাজ খুলে চাপিয়েছে তরোয়ালের মাথায়। সঙ্গে একজন মাত্র দোসর। আমরা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। লোকটা হাত বাড়িয়ে তার মাথার টুপিটা এগিয়ে দিলে—টুপিটা চেরি ফলে ভর্তি। দোসররা বারো পা জায়গা মেপে আমাদের তফাৎ করে দাঁড় করিয়ে দিলে। কানুন-মাফিক আমারই আগে গুলি করার কথা। কিন্তু রাগে এমন বেসামাল বোধ হচ্ছিল নিজেকে যে ভয় হল হাত কেঁপে যাবে। তাই প্রথম গুলি করার পালা ওকেই ছেড়ে দিলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজী হল না। ঠিক হল লটারি হবে। কপাল ওর চিরকালই সুপ্রসন্ন—লটারিতে প্রথম গুলির পালা পড়ল ওর ভাগ্যে। ও তাক করলে কিন্তু গুলি বেরিয়ে গেল আমার টুপির মধ্যে দিয়ে। এবার আমার পালা। এতদিন পরে এবার ওর জান আমার মুঠোয়। আমি ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলাম, দেখতে চাইছিলাম সেখানে এতটুকু কোনো উদ্বেগ ছায়া ফেলেছে কিনা। ও কিন্তু অনায়াসে আমার পিস্তলের লক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে টুপি থেকে বেছে বেছে পাকা চেরি ফলগুলো খেতে শুরু করল, বিচিগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল প্রায় আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ততদূর অবধি। ওর এই নিশ্চিন্ত ভাবটা আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে। মনে হল লোকটা যখন তার জীবনটাকে মূল্যই দিচ্ছে না, তখন সে জীবন কেড়ে নিয়ে আমার লাভ কি? বীভৎস একটা চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। পিস্তল নামিয়ে বললাম:

'দেখছি তুমি ভারি ব্যস্ত। মরার কথা ভাবারও সময় নেই। তোমার প্রাতরাশের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে আমি চাই না।' ও বললে, 'একটুও না, তোমার জন্যে মোটেই আমার অসুবিধা হচ্ছে না। দয়া করে গুলি করেই ফেল না। তবে তোমার যা ইচ্ছে। একটা গুলি তোমার পাওনা রইল— যখনই চাইবে, আমি রাজী।' আমি দোসরদের দিকে ফিরে বললাম, আপাতত গুলি করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ডুয়েল ওই অবস্থাতেই সেদিন শেষ হল।

সৈন্যদল থেকে ইস্তফা দিয়ে আমি এসে বসলাম এই ছোটো শহরটায়। সেদিন থেকে প্রতিশোধ চিন্তা ছাড়া একটা দিনও আমার কাটেনি। এতদিনে আমার প্রতীক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে…'

সিলভিও তার পকেট থেকে আজ সকালে আসা চিঠিটা বার করে আমায় দিলে। চিঠিতে মস্কো থেকে কে একজন (সম্ভবত তার উকিল) জানাচ্ছেন যে জনৈক ব্যক্তি নাকি শীগগিরই এক সুন্দরী তরুণীর পাণিপীড়ন করবেন।

সিলভিও বললে, 'আন্দাজ করতে পেরেছ নিশ্চয়ই এই জনৈক ব্যক্তিটি কে? আমি মস্কো চললাম। টুপি-ভর্তি চেরি খেতে খেতে নির্বিকার ভাবে ও সেদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে পেরেছিল। এবার দেখা যাবে বিয়ের মুহূর্তে তেমনি নির্বিকার ভাবে সে মরতে পারে কি না।'

এইকথা বলে সিলভিও উঠে দাঁড়াল, টুপিটা ছুঁড়ে ফেললে মেঝের ওপর আর খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলে। পরস্পর-বিরোধী আবেগের বিচিত্র আলোড়নে আলোড়িত হয়ে স্তব্ধের মতো দাঁড়িয়ে আমি তাঁর কাহিনীটা শুনে গেলাম আগাগোড়া।

চাকর এসে খবর দিলে ঘোড়া তৈরি হয়ে গেছে। সিলভিও আমার হাত চেপে ধরল আবেগভরে। আমরা পরস্পরকে চুম্বন করলাম। সিলভিও গাড়িতে উঠল। দুটি মোট তাতে আগেই চাপানো হয়েছে—একটাতে সিলভিওর পিস্তলগুলো, অন্যটায় তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। পরস্পরের কাছ থেকে আর একদফা আমরা বিদায় নিলাম। ঘোড়া ছুটল কদমে।

২

কয়েক বছর কেটে গেছে। সংসারের চাপে আমি 'ক' জেলার দীনদরিদ্র একটা গ্রামে ডেরা নিতে বাধ্য হয়েছি। সম্পত্তির দেখাশুনায় জড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ত সেই আগেকার হৈ-হল্লা-ভরা চিন্তাহীন জীবনটার জন্যে। যে জিনিসটা এখানে আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না সে ওই শীত আর শরতের একান্ত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলো। ডিনার খাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি যে করেই হোক, গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে-কথা বলে, নয় তো কাজ তদারকের জন্যে মহালের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, নয়তো নতুন চালু করা কোনো খামার ইত্যাদি দেখে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু সন্ধ্যে নামতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পেতাম না। বিভিন্ন দেরাজের তলা আর ভাঁড়ার হাতড়িয়ে যে কটি বই পেয়েছিলাম, তা ইতিমধ্যেই প্রায় মুখস্ত হয়ে এসেছিল। বাড়ির ঠাকুরাণী কিরিলোভনা তার ঝুলি উজাড় করে একই কাহিনী বার বার করে শুনিয়েছে। মেয়েদের যে সব গানের আসর বসত তা শুনে আমার মন শুধু বিষাদেই ভরে উঠত। হয়ত মদ খাওয়াই ধরতাম কিন্তু তাতে মাথা ধরে উঠত প্রচণ্ড।

তাছাড়া, শুধু নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় মাতাল হয়ে ওঠার কথা ভাবতে গেলে আমার বেশ ভয় করত একথা খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বলতে গেলে এই রকমের লোকেরা হয় সবচেয়ে জঘন্য ধরণের মাতাল—আমাদের জেলায় এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমার দেখা আছে। এই ধরণের জন দুই-তিন হতভাগাই ছিল আমার একমাত্র পড়শী। তাদের যা কিছু আলাপ সব হিক্কা আর দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা। এরকম সঙ্গীর চেয়ে নির্জনতা বরং সহনীয়।[৫]

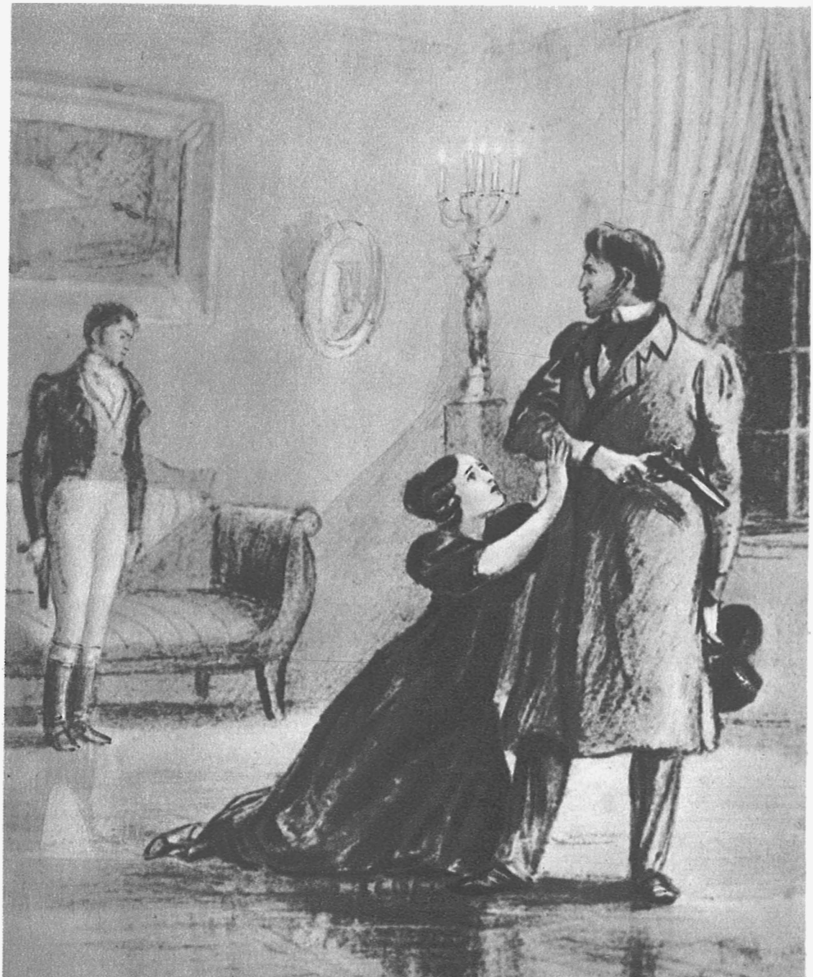
চার ভার্স্ট দূরে ছিল কাউণ্টেস শ্রীমতী 'ব' এর ফলাও সম্পত্তি। কিন্তু সেখানে গোমস্তা ছাড়া আর কেউ থাকত না। কাউণ্টেস তাঁর জমিদারিতে এসেছিলেন শুধু একবার, বিয়ের প্রথম বছরে, কিন্তু মাসখানেকের বেশি থাকেননি। কিন্তু আমার নির্জন বাসের দ্বিতীয় বসন্তকালে শোনা গেল কাউণ্টেস তাঁর স্বামীসহ গ্রীষ্মে জমিদারি দেখতে আসবেন বলে মনস্থ করেছেন। জুনের শুরুতে তাঁরা সত্যি সত্যি এলেন।

ধনী কোনো প্রতিবেশীর আগমন গ্রামবাসীদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। জমিদারেরা আর তাদের বাড়ির লোকেরা এ নিয়ে ঘটনার দু'মাস আগে থেকে কথা কইতে শুরু করে এবং পরবর্তী তিনবছর পর্যন্ত তার আলাপ চালিয়ে যায়। আমার নিজের কথাই স্বীকার করা যাক। তরুণী এবং সুন্দরী এক প্রতিবেশিনী আসার খবরটা আমার ওপরেও বেশ জোর ছাপ ফেলেছিল। মহিলাটিকে দেখার জন্যে আমার তর সইছিল না। ওঁরা আসার ঠিক পরের রবিবারেই আমি ডিনারের পর 'ওঁদের' গ্রামখানার দিকে রওনা দিলাম—ইচ্ছে ছিল হুজুরের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী এবং বিনীত দাসানুদাস বলে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়াব।

চাপরাশি আমাকে নিয়ে কাউণ্টের পাঠকক্ষে বসিয়ে খবর দেবার জন্যে চলে গেল। প্রশস্ত ঘরখানা রাজার হালে সাজানো। দেয়ালের সঙ্গে বইভরা অনেক আলমারি। প্রত্যেকটা আলমারির ওপরে ব্রঞ্জের এক একটা আবক্ষ মূর্তি। শ্বেতপাথরে বাঁধানো অগ্নিকুণ্ডের ওপরে মস্ত একটা আরশি। সবুজ কার্পেটে মেজে ঢাকা তার ওপর গালিচা বিছানো। আমার গরিব ডেরায় বিলাসের কোনো অবকাশ ছিল না। অন্যের ঐশ্বর্য দেখাও আমার অনেক কাল বন্ধ। এর মধ্যে পড়ে তাই আমি খানিকটা জড়োসড়োর মতো স্নায়বিক উদ্বেগ নিয়ে কাউণ্টের দর্শনের অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক যেন মন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে এসেছি কোনো গ্রাম্য আবেদনকারী। দরজা খুলে ভেতরে যিনি এলেন তাঁর বছর বত্রিশ বয়স। চেহারা অতি সুশ্রী। কাউণ্ট আমার দিকে যেন আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুর মতো এগিয়ে এলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নিজেই আমার নাম বললেন। দুজনে মিলে বসা গেল। কাউণ্ট কথাবার্তা কইতে লাগলেন খুব সহজ সুরে, সৌজন্যের সঙ্গে। দীর্ঘকাল ধরে নিঃসঙ্গ ভাবে কাটাবার ফলে আমার মধ্যে যে সঙ্কোচ এসে জমেছিল এতে তা শীগগিরই কেটে গেল। বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে শুরু করেছি এমন সময় কাউণ্টেস এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও আরো বেশি বিব্রত লাগল নিজেকে। ভদ্রমহিলা সত্যিই এক রমনীয় সৃষ্টি। কাউণ্ট আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি সহজ হবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু যতই স্বচ্ছন্দ হতে যাই ততই যেন ভেতর ভেতর বিব্রত হয়ে উঠতে থাকি। আমি যাতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাই এবং অপরিচিতদের সাহচর্যটুক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সেজন্যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করলেন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হলে লোকে

যেসব করে, তেমনিভাবে বিশেষ কোনো সৌজন্যের আতিশয্য না দেখিয়ে। ইতিমধ্যে আমি এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে বইপত্তর, ছবি-টবি দেখে বেড়াতে লাগলাম। ছবি সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্যই, তবু আমার চোখ গিয়ে পড়ল একটার দিকে। ছবিটা ছিল সুইজারল্যাণ্ডের একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য—কিন্তু আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম ছবিটার জন্যে তত নয়, ছবির মধ্যে একই জায়গায় দুটি বুলেটের গর্ত হয়ে আছে বলে। 'খুব পাকা নিশানা' আমি বললাম কাউণ্টের দিকে চেয়ে। কাউণ্ট বললেন, 'হ্যাঁ, চমৎকার নিশানা। আপনিও কি ভালো গুলি করতে পারেন?' বললাম, 'পয়লা নম্বরের'। আলাপ আলোচনাটা যে অবশেষে আমার অতিপ্রিয় একটা বিষয়ে এসে পড়েছে এতে খুশি হয়ে উঠেছিলাম, 'তিরিশ পা দূর থেকে গুলি করলেও কোনো তাস আমার হাত ফসকাবে না—অবশ্য যে সব পিস্তলে আমার অভ্যেস, তাই দিয়ে'। 'সত্যি?' ভয়ানক মনোযোগের ভাব নিয়ে কাউণ্টেস জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও তিরিশ পা দূরে তাস গুলি করতে পারো নাকি গো?' কাউণ্ট বললেন, 'একদিন চেষ্টা করে দেখা যাবে। বয়সকালে আমিও নেহাৎ খারাপ নিশানী ছিলাম না, কিন্তু এ চার বছরে আমি একবারও পিস্তল হাতে করিনি।' আমি বললাম, 'ওহ্, তাহলে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, হুজুর এখন কুড়ি পা দূরের তাসকেও গুলি করতে পারবেন না—পিস্তল চালাতে হলে দৈনিক তালিম দিয়ে যেতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা দেখেছি। আমাদের রেজিমেণ্টের সেরা নিশানীদের একজন বলে আমার নাম ছিল। কিন্তু একবার গোটা একটা মাস আমাকে কাটাতে হয় পিস্তল না ছুঁয়ে। আমারটা মেরামত হচ্ছিল। তারপর, জানেন হুজুর? আবার প্রথম গুলি চালাবার দিন পঁচিশ পা

দূরের একটা বোতল, মারতে গিয়ে চার বার ফসকালাম। আমাদের ক্যাপটেনের মুখ ছিল খুব তুখোড়, রসিকতাও করত খুব। সে বললে, "বোতল মারা তোমার সইবে না বন্ধু, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছে"। আজ্ঞে না, দৈনিক অভ্যাসের ব্যাপারটা অবহেলা করা উচিত নয়, নইলে শীগগিরই দেখবেন আপনি সব ভুলে গেছেন। সব চেয়ে ভালো নিশানী বলে আমি যাকে জানতাম, সে প্রতিদিন অভ্যেস করত, ডিনারের আগে অন্তত তিনবার ক'রে সে গুলি ছুঁড়ত। ব্যাপারটা তার কাছে ছিল যেন ডিনারের আগে এক গ্লাস ভদকা খাওয়ার মতো একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।' কথা কওয়ার মতো বিষয় পেয়েছি দেখে কাউণ্ট আর কাউণ্টেস খুশি হয়ে উঠলেন। কাউণ্ট বললেন, 'লোকটার গুলি ছোঁড়া সম্পর্কে আরো দু'চারটে গল্প শোনান না!' 'শুনবেন? তাহলে বলি। কখনো হয়ত দেখা গেল দেয়ালের ওপর একটা মাছি এসে বসেছে—কাউণ্টেস, আপনি হাসছেন কিন্তু দিব্যি দিয়ে বলতে পারি সব সত্যি—যাই হোক, দেখা গেল দেয়ালে একটা মাছি বসেছে, অমনি সে চিৎকার করে উঠত, "কুজকা, আমার পিস্তল।" কুজকাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ভর্তি পিস্তল নিয়ে এসে হাজির। বাস্ অমনি গুম্, দেখা গেল মাছিটা একেবারে দেয়ালের সঙ্গে চেপটে গিয়েছে।' 'সাবাস।' কাউণ্ট তারিফ করে উঠলেন, 'কি নাম লোকটার?' 'আজ্ঞে লোকটার নাম সিলভিও।' 'সিলভিও?' কাউণ্ট লাফিয়ে উঠলেন চেঁচিয়ে, 'আপনি কি সিলভিওকে চিনতেন?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওর বেজায় বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের রেজিমেণ্টের সকলে তাকে দেখত ঘরের লোকের মতো। কিন্তু সে আজ প্রায় বছর পাঁচেক হল, লোকটার কোনো খবর জানি না। তাহলে হুজুরও তাকে চিনতেন?' 'হ্যাঁ চিনতাম, খুব ভালো করেই চিনতাম। সে কি কখনো



আপনাকে বলেনি··· কিন্তু না বলাই সম্ভব··· সে কি তার জীবনের খুব অদ্ভুত একটা ঘটনার কথা বলেছিল কখনো?' 'সেই একটা জোয়ান চালবাজ তার মুখে যে থাপ্পড় মেরেছিল, আপনি কি তার কথা জিজ্ঞেস করছেন?' 'সেই লোকটার নামটা সে কখনো বলেনি?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে না, সে তা বলেনি।' কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, 'ওহ্-হো', চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'মাপ করবেন, আমার খেয়ালই হয়নি··· সে কি আপনিই?' 'আমিই', কাউণ্ট বললেন, মুখটা তাঁর তখন ভারি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। 'আর ঐ বুলেট-বেঁধা ছবিটা হল আমাদের শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি চিহ্ন···।' কাউণ্টেস্ বলে উঠলেন, 'মাগো! না বাপু, ও নিয়ে আর আলাপ তুলো না, তোমায় মিনতি করে বলছি। জানোই তো ঘটনাটার কথা শুনলে আমার বড়ো ভয় করে··· কাউণ্ট বললেন, 'হুঁ—কিন্তু আমি বলব, সবটা বলব। উনি এইটুকু জানেন যে আমি কেমন করে তাঁর বন্ধুকে অপমান করেছিলাম। সিলভিও কেমন করে তাঁর প্রতিশোধ নিল, সেটাও উনি শুনে রাখুন'—কাউণ্ট একটা আরাম-কেদারা টেনে আনলেন আমার জন্যে। দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমি শুনে গেলাম·

'আমার বিয়ে হয় পাঁচ বছর আগে। মধুযামিনীর প্রথম মাসটা আমার এই গ্রামে কাটে। এই বাড়িতেই আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো আমি পেয়েছি আর পেয়েছি আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের একটি মুহূর্ত।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি। আমার স্ত্রীর ঘোড়াটা ছটফট করতে শুরু করেছিল। উনি ভয় পেয়ে আমার হাতে লাগাম দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে থাকেন। ঘোড়ায় চেপে আমি চলে

যাই আগে আগে। এসে দেখি বাড়ির আঙিনায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, পাঠকক্ষে কে একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকটা তার নাম বলেনি, শুধু বলেছে আমার সঙ্গে নাকি তার কাজ আছে। এই ঘরটায় ঢুকে দেখলাম সন্ধ্যার ছায়ায় একটা লোক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এইখানটায়। লোকটার সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা, দাড়ি গোঁপ কামানো হয়নি। আমি তার কাছে যেতে যেতে মনে করার চেষ্টা করছিলাম কে হতে পারে। "চিনতে পারছ না কাউণ্ট?" লোকটা বললে কাঁপা কাঁপা গলায়। "সিলভিও!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম এবং সত্যি কথা বলতে কি, টের পেলাম মাথার চুল আমার খাড়া হয়ে উঠেছে। "সিলভিও-ই বটে; এইবার আমার গুলি করার পালা। পিস্তল খালি করার জন্যে আমি এসেছি, তুমি তৈরি?" ওর বুক পকেট থেকে একটা পিস্তল বেরিয়ে ছিল খানিকটা। আমি বারো পা জায়গা মেপে গিয়ে দাঁড়ালাম ওই কোণটায়। বললাম একটু তাড়াতাড়ি করতে— আমার স্ত্রী আসার আগেই যেন গুলি হয়ে যায়। ও দেরি করতে লাগল। আলো চাইলে। মোমবাতি নিয়ে আসা হল। আমি দরজায় কুলুপ দিয়ে হুকুম দিলাম কাউকে যেন ভেতরে আসতে দেওয়া না হয়। তারপর আবার অনুরোধ করলাম, "তাড়াতাড়ি করো"। ও পিস্তলটা বার করে নিশানা করতে লাগল। এক একটা সেকেণ্ড আমি গুণে চলেছি··· ভাবছি শুধু আমার স্ত্রীর কথা··· পুরো এক মিনিট ধরে চলল এই ভয়ঙ্কর উদ্বেগের অবস্থা। হঠাৎ সিলভিও তার হাত নামিয়ে নিলে, বললে, "দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে আমার পিস্তল ঠিক চেরির বিচি দিয়ে ভর্তি করা হয়নি। বুলেটগুলো অনেক কড়া চিজ্। কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক ডুয়েল হচ্ছে না, হচ্ছে হত্যা। নিরস্ত্র লোকের

দিকে পিস্তল তাক করা আমার ধাতস্থ নয়। সবটাই আবার নতুন করে শুরু করা যাক… কে প্রথম গুলি করবে সেটা লটারি করা হোক।” আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে… যতদূর মনে পড়ে আমি সায় দিইনি… শেষ পর্যন্ত আর একটা পিস্তল গুলি-ভর্তি করা হল, লটারির জন্যে দুটো কাগজ ভাঁজ করে রাখা হল ওর সেই টুপিটার মধ্যে যেটাতে আমার গুলি গিয়ে বিঁধেছিল। এবং এবারেও ভাগ্যমন্ত কাগজখানা আমারই কপালে পড়ল। “শয়তানের কপাল তোমার কাউণ্ট”, লোকটা এমন একটা হাসি হেসে বললে যা আমি কখনো ভুলব না। আমায় কী যে পেয়ে বসেছিল, আমাকে দিয়ে গুলি করিয়ে নিতে ও কেমন করেই বা পারলে, জানি না।… কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুলি আমি করলাম, আর ঐ ছবিটাতে গিয়ে সে গুলি লাগল।' (বুলেট-বেঁধা ছবিটার দিকে কাউণ্ট দেখালেন। কাউণ্টের গাল দুটো উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। কাউণ্টেসের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তাঁর গায়ের শালের চেয়েও বেশি। আমার মুখ দিয়েও একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল।)

কাউণ্ট বলে চললেন, 'আমি গুলি করলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, গুলিটা ফসকে গেল। তারপর সিলভিও… সেই মুহূর্তে তার চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর… সিলভিও নিশানা করতে শুরু করল আমার দিকে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ছুটে এসে মাশা চিৎকার করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মাশাকে দেখেই বোধ হয় বিচার বুদ্ধি ফিরে পেলাম। বললাম, “দেখছ না আমরা রহস্য করছি যে গো? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার। যাও, এক গ্লাস জল খেয়ে

ফিরে এসো। আমার পুরনো বন্ধু আর সঙ্গীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।' মাশা আমার কথায় ভরসা করতে পারছিল না। দুর্ধর্ষ সিলভিওর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি বলুন আমার স্বামী যা বলছেন তা কি ঠিক? একি সত্যি যে আপনারা দুজনে শুধু রহস্যই করছেন?" সিলভিও বললে, "উনি সবসময়েই রহস্য করেন কাউণ্টেস্। এক সময় আমার মুখে তিনি একটা থাপ্পড় কষেছিলেন নেহাৎ রহস্য করে, আমার টুপির মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়েছিলেন, তাও রহস্য করে এবং এইমাত্র তাঁর নিশানা ফসকে গেল সেও রহস্য করেই। এবার আমারও একটু রহস্য করার ইচ্ছে হয়েছে..." এই কথা বলে সে আমার স্ত্রীর সামনেই আমার দিকে নিশানা করতে শুরু করলে! মাশা গিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরল। উন্মাদের মতো আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "ছি ছি মাশা, উঠে এসো! আর আপনি—একজন হতভাগ্য মহিলার প্রতি উপহাস করা আপনি বন্ধ করবেন কি? আপনি গুলি করতে চান, কি চান না?" "চাই না" সিলভিও জবাব দিলে, "আমি তৃপ্তি পেয়েছি। তোমার চোখে উদ্বেগ দেখতে চেয়েছিলাম—আতঙ্ক দেখতে চেয়েছিলাম, দেখলাম। তোমাকে দিয়ে ফের আমার দিকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য করলাম। আর আর কিছু আমি চাই না। এর পর আমার কথা তুমি আর কখনো ভুলতে পারবে না। এবার তোমার ধর্ম তোমার কাছে।"—এই কথা বলে সে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে ফিরে তাকালে এবং প্রায় কোনরকম নিশানা না করেই একটা গুলি করে অন্তর্ধান করলে। আমার স্ত্রী মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। চাকর বাকরদের কারো সাহস হয়নি ওকে আটকে রাখে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে ওরা শুধু চেয়েছিল লোকটার দিকে। সিলভিও বারান্দায়

দাঁড়িয়ে কোচোয়ানকে হাঁক দিল এবং কি হল তা বুঝে ওঠার আগেই সে চলে গেল।'

কাউণ্ট আর কিছু বললেন না। যে গল্পের শুরুটা একদিন আমায় অমন আলোড়িত করেছিল তার শেষটা এই ভাবেই আবিষ্কার করা গেল। এ গল্পের নায়কের সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হয়নি। শোনা যায় সিল্‌ভিও নাকি আলেকজান্দ্র ইপ্‌সিলান্তি [৬] বিদ্রোহের মধ্যে একটা বাহিনীর নেতৃত্ব করে এবং স্কুলিয়ানির যুদ্ধে মারা যায়।

তুষার ঝঞ্ঝা





বন্ধুর পথ দিয়ে ঘোড়া দৌড়য়
তুষারের স্তূপ তারা ক্ষুরেতে মাড়ায়...
অকস্মাত দেখা গেলো স্তব্ধতার মাঝে
নির্জন মন্দির এক সম্মুখে রয়েছে।

তুহিন ঝঞ্ঝায় মোছে দিগন্ত- সহসা
তুষারের ফুল ঝরে ধুরন্ত আকারে
কৃষ্ণবর্ণ কাক এক দুরন্ত ডানায়
নেমে আসে ধাবমান স্লেজের উপরে।
ডাকে তার অমঙ্গল ভবিষ্যদ্বাণী!
ছুটন্ত ঘোড়ারা যেন চমকিয়ে চায়
আতঙ্কে দাঁড়িয়ে ওঠে তাদের কেশর
বিষণ্ণ সুদূরে তারা সভয়ে তাকায়।

—জুকোভ্‌স্কি [৭]

আমাদের ইতিহাসে যে সব দিন ভোলার নয়, সেই সময়, ১৮১১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে নেনারাদভোর জমিদারি মহালে বাস করতেন মাননীয় গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ্‌ ‘র’। আতিথ্য ও দাক্ষিণ্যের জন্যে সারা জেলার লোক তাঁকে চিনত। বাড়িতে তাঁর পাড়াপড়শীদের আগমনের

বিরাম ছিল না। কেউ আসত পানাহার করতে আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ কোপেক বাজির 'বোষ্টন' খেলতে, আবার কেউ কেউ আসত তাঁর মেয়ে মারিয়া গাভ্রিলভনার দর্শন পাবার জন্যে। মেয়েটির বয়স ছিল সতেরো, দেখতে তন্বী, মুখের রঙ ফ্যাকাশে ধরণের। ধনী পাত্রী হিসেবে মেয়েটির সুনাম রটেছিল এবং নিজের জন্যে, নয়তো নিজের ছেলের জন্যে, মেয়েটিকে বৌ করে ঘরে তোলার আশা ছিল অনেকেরই।

মেয়েটি বেড়ে উঠেছিল ফরাসী উপন্যাস পড়ে, সুতরাং প্রেমে তাকে পড়তেই হল। যাকে সে পছন্দ করলে সে কিন্তু একজন দরিদ্র নিম্নতন অফিসার, ছুটি কাটাতে এসেছিল তার পিতৃপুরুষের ভিটেয়। যুবকটিও যে ঐ একই জ্বালায় জ্বলে মরছিল তা না বললেও চলে। এবং না বললেও চলে, যে ওদের পরস্পর আকর্ষণ লক্ষ্য করে মেয়েটির মা-বাপ নিষেধ করে দিলে যেন মেয়েটি ওর কথা চিন্তা করা ছাড়ে এবং নিজেরা এমন হাঁড়ির মতো মুখ করে ছেলেটির সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগল যেন ও একজন অবসর-প্রাপ্ত এ্যাসাইজ-হাকিম বিশেষ।

ফলে আমাদের প্রেমিক যুগল পত্রালাপের পথ নিলে আর প্রত্যেকদিন তাদের দেখা হতে লাগল পাইন কুঞ্জের নির্জনতায়, নয়ত প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র গীর্জার নিকটে। সেখানে তারা চিরন্তন প্রেমের শপথ নিত। নিজেদের পোড়া কপাল নিয়ে আক্ষেপ করত, আর চেষ্টা করত হরেক রকমের সব ফন্দি বার করতে। ইত্যাকার চিঠিপত্র আর আলাপ আলোচনার পরিণতি স্বরূপ অবশেষে তারা স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল: যেহেতু আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না এবং নির্দয় মা-বাপ আমাদের সুখের পথে কাঁটা

দিচ্ছে, সেইহেতু মা-বাপের মতামতের তোয়াক্কা না করলেই তো হয়? সহজেই আন্দাজ করা যায় যে এই চমৎকার সমাধানটি সর্বপ্রথম উদিত হবে তরুণটির মনে, এবং মারিয়া গাভ্রিলভনার রোমান্টিক কল্পনা তাতে সাতিশয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শীত এসে পড়ায় তাদের দেখাশোনা বন্ধ হল বটে কিন্তু পত্রালাপ হয়ে উঠল আরো সজীব। ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ তার প্রত্যেকটা চিঠিতে প্রিয়তমাকে অনুনয় করতে লাগল, এসো, আমার হও, গোপনে বিয়ে করে কিছুদিন লুকিয়ে থাকা যাবে, পরে গিয়ে বাপ-মায়ের পা জড়িয়ে ধরব। প্রেমিক যুগলের নির্ভীক প্রেম এবং তার জন্যে এই দুঃখ বরণ দেখে ওঁদের মন নরম না হয়ে পারে না, নিশ্চয়ই ওঁরা ডাক দিয়ে বলবেন, আয় বাছারা, আমাদের কোলে ফিরে আয়!

মারিয়া গাভ্রিলভনার মন ঠিক করতে অনেক সময় লাগল। পালিয়ে যাবার অসংখ্য পরিকল্পনা সে এক এক করে বাতিল করলে। অবশেষে একদিন সে মত দিল: ঠিক হল সে রাতের খাবার টেবিলে না বসে মাথা ধরেছে বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঠাঁই নেবে। মেয়েটির ঝিকে এর মধ্যে টানতে হবে। ওরা দুজন তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে চলে যাবে বাগানের মধ্যে। তার পিছনে একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাতে চেপে নেনারাদভো থেকে পাঁচ ভার্স্ট দূরে যেতে হবে জাদ্রিনো গ্রামে এবং সোজা গিয়ে ঢুকবে গীর্জায়। ভ্লাদিমির সেখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

যেদিন পালাবার কথা, তার আগের দিন মারিয়া সারা রাত একটুও ঘুমোতে পারলে না। আলমারি নেড়ে চেড়ে পোশাকের একটা পোঁটলা বানালো সে,

তারপর কথা গেঁথে গেঁথে দুটি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলে, একটি তার ভাবপ্রবণ এক সখির কাছে, আর একটি মা-বাপের কাছে। তাতে অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বিদায় চেয়ে বলা হল তার কাজের পেছনে রয়েছে হৃদয়াবেগের অপরাজেয় তাগিদ এবং চিঠি শেষ করা হল এই বলে যে যেদিন সে আবার তার মা-বাপের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াতে পারবে, সেইটেই হবে তার সবচেয়ে সুখের দিন। চিঠি দুটিকে আঁটল একটি 'টুলা' সীল দিয়ে—তাতে মাননসই একটি শ্লোকের ওপর উত্তপ্ত দুটি হৃদয়ের নক্শা আঁকা। অবশেষে ঠিক ভোরের আগে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। যেটুকু তন্দ্রা এল, ভয়ানক ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখায় তাও ভেঙে যেতে লাগল মিনিটে মিনিটে। একবার সে স্বপ্ন দেখলে যেন গীর্জায় যাবার জন্যে স্লেজে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বাবা এসে পথ আটকালেন আর বরফের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এক অতল অন্ধকূপের মধ্যে… মারিয়া গাভ্রিলভনা সবেগে নিচে পড়ে যাচ্ছে, দম তার একেবারে বন্ধ হয় আর কি। আর একবার সে দেখলে ভ্লাদিমির যেন ঘাসের ওপর শুয়ে আছে—সারা শরীর তার বিবর্ণ, রক্তমাখা। মরতে মরতে তীক্ষ্ণ গলায় দমকে দমকে অনুরোধ করে সে বলছে বিয়েটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে…। ভয়াবহ বিশৃংখল নানা মূর্তি তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে যখন সে উঠলে, তখন সত্যি করেই তার মাথা ধরে উঠেছে, গায়ের রঙ হয়েছে আরো ফ্যাকাশে। মেয়ের এই উদ্বিগ্ন মূর্তি দেখে মারিয়ার মা-বাপের সস্নেহ উদ্বেগ আর প্রশ্নের বিরাম ছিল না: 'কি হয়েছে মাশা, অসুখ করেছে নাকি মাশা?' আর তাতে মারিয়ার যেন বুক

ভেঙে যেতে লাগল। ওঁদের শান্ত করতে গিয়ে মারিয়া হাসিখুশি দেখাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পেরে উঠল না। সন্ধ্যা হল। বাপের বাড়িতে এই তার শেষদিন একথা ভেবে বুক টনটনিয়ে উঠল মারিয়ার। দম তার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল বারবার। আশেপাশের এতদিনকার পরিচিত যত জিনিসপত্র লোকজন সবার কাছ থেকে সে বিদায় নিলে মনে মনে, গোপনে গোপনে। রাতের খাবার দেওয়া হল। বুক তার টিপটিপ করে উঠল সজোরে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে রাতে সে খাবে না। ওঁরা রোজকারের মতো মেয়েকে চুমু দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। মারিয়ার চোখের জল আর বাধা মানতে চাইছিল না। নিজের ঘরে কোনো রকমে একবার ঢুকতে পেয়ে আরাম কেদারাটার ওপর সে লুটিয়ে পড়ল কান্নায়। মন চাঙ্গা করতে বলে দাসীটি তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। সব কিছুই তৈরী। আর আধঘণ্টা পরে মাশা তার বাপের বাড়ি, তার নিজের ঘরখানা, তার শান্ত কুমারী জীবনের কাছ থেকে বিদায় নেবে চিরকালের মতো।··· বাইরে তখন শুরু হয়েছে, একটা তুষার ঝঞ্ঝা। ঝড় উঠছে গোঁ গোঁ করে। জানলা দরজার খড়খড়িগুলো খট্‌খটিয়ে নড়ছে। মারিয়ার কাছে এ সব কিছুই মনে হচ্ছিল যেন কীসের একটা শাসানি—কিছু একটা শোকার্ত সঙ্কেত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়ল। মাশা তার কাঁধের ওপর একটা শাল জড়ালে, গায়ে চাপালে গরম একটা পোশাক, তারপর গয়নার হাত-বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এল খিড়কির দরজা দিয়ে, দুটি পুঁটলি হাতে করে তার ঝিও এল সঙ্গে সঙ্গে। ওরা যখন বাগানে গিয়ে পৌঁছুল, তখনো তুষার ঝঞ্ঝা একটুও কমেনি। যেন এই তরুণী অপরাধিনীকে নিরস্ত করবার জন্যেই মুখের ওপর

এসে ঝাপটা মারছে হাওয়া। বাগানের কিনার পর্যন্ত যেতেই ওদের হয়ে এল। রাস্তায় স্লেজটা দাঁড়িয়ে আছে। হিমে জমতে জমতে ঘোড়াগুলো আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। অস্থির জানোয়ারগুলোকে বাগ মানাবার জন্যে ভ্লাদিমিরের কোচোয়ানকে গাড়ির ডাণ্ডাটার সামনে কেবল পায়চারি করতে হচ্ছিল এদিক ওদিক। দাসী সমেত তরুণীটিকে সে এনে বসালে তার গাড়ির ভেতরে, গয়নার বাকস আর পোঁটলাগুলো স্লেজের ওপর তুলে দিয়ে সে বসল লাগাম নিয়ে। সোৎসাহে কদম বাড়ালো ঘোড়াগুলো। এবার কপাল আর কোচোয়ান তেরেশ্‌কার হাতযশের ওপর মারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক আমাদের নবীন প্রেমিকটি কি করছেন।

সেদিন সারাবেলা শুধু এখান থেকে ওখানে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়িয়েছে ভ্লাদিমির। সকালে সে গিয়েছিল জাদ্রিনোর পুরোহিতের কাছে—তার সম্মতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তারপর সে গেল আশেপাশের জমিদারদের মধ্যে থেকে সাক্ষী জোগাড় করতে। প্রথমে যাঁর কাছে সে গেল তাঁর নাম দ্রাভিন, বছর চল্লিশ বয়সের সর্বনিম্নপদস্থ একজন অবসর-নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার। তিনি সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন ব্যাপারটা দেখে তাঁর সে আমলের কথা আর ঘোড়সওয়ারীদের নানা রগড়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভ্লাদিমিরকে ভরসা দিয়ে তিনি তাকে জোর করে আটকে রাখলেন দুপুরের খাওয়ার জন্যে। বললেন, বাকি দুজন সাক্ষী জোগাড় করতে কোনো অসুবিধাই হবে না। আর, বলতে কি দুপুরের খাওয়ার পর এসে হাজিরও হয়ে গেলেন জমি জরীপের জনৈক কানুনগো স্মিদ্‌ত্‌ এবং তার সঙ্গে জেলা পুলিস অফিসারের এক ছেলে। স্মিদ্‌ত্‌-এর বেশ বড়ো বড়ো মোচ, পায়ে

ঘোড়সওয়ারী কাঁটা। ছেলেটার বয়স প্রায় বছর ষোলো, হালে সে উল্‌হানের একটা রেজিমেণ্টে ঢুকেছে। ওরা ভ্লাদিমিরের প্রস্তাবে রাজি তো হোলোই, উপরন্তু ঘোষণা পর্যন্ত করে বসল যে ভ্লাদিমিরের জন্যে তারা জান দিতেও প্রস্তুত। ভ্লাদিমির আবেগে কোলাকুলি করলে, তারপর যোগাড়যন্ত্র করার জন্যে রওনা দিলে বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ। বিশ্বাসী কোচোয়ান তেরেশ্‌কাকে যথাবিহিত উপদেশ দিয়ে সে তাকে ত্রয়কা * সমেত পাঠালে নেনারাদভোতে। তারপর নিজের জন্যে তার এক-ঘোড়ার স্লেজখানাকে জুততে বলে রওনা দিলে জাদ্রিনোর দিকে—আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সেখানে মারিয়া গাভ্রিলভনার এসে পড়ার কথা। রাস্তাটা ভ্লাদিমিরের পরিচিত, হাঁকিয়ে যেতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগা উচিত নয়।

গ্রাম ছেড়ে বাইরের খোলা এলাকায় পৌঁছানো মাত্র কিন্তু ঝড় উঠল। তুষার ঝঞ্ঝা এমন ঘনঘটায় নামল যে চোখে কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। মিনিট খানেকের মধ্যেই সারা রাস্তা ঢেকে একাকার হয়ে গেল বরফে, আশেপাশের সবকিছু হারিয়ে গেল একটা তুহিন ঝিলিমিলির মধ্যে—মিটমিটে হলদেটে সেই কুজ্‌ঝটির মধ্যে শুধু পাক খেয়ে খেয়ে ঝরতে লাগল বরফের শাদা শাদা টুকরো। আকাশ মাটি সবকিছু হয়ে গেল একাকার। ভ্লাদিমির টের পেলে সে একটা মাঠের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে। রাস্তাটায় ফিরে যাবার হাজার চেষ্টা করেও সে পারলে না। ঘোড়াটা যতোই এগোয় ততই গিয়ে

* ত্রয়কা—তিন ঘোড়ায় টানা রুশদেশের গাড়ি।

পড়ে এক অজানা রাজ্যের মধ্যে—কখনো ধাক্কা খায় কোনো তুষার স্তূপের সঙ্গে, কখনো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গর্তের মধ্যে। স্লেজখানা বারবার উলটে যাচ্ছিল। ভ্লাদিমিরের একমাত্র চেষ্টা ছিল কিছুতেই যাতে সে পথটা না হারায়। কিন্তু তার ধারণা মতো আধঘণ্টাখানেক সময় কেটে যাবার পরেও দেখা গেল সে জাদ্রিনো গ্রামের উপকণ্ঠের গুল্মবনটুকু পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারেনি। আরো মিনিট দশেক কাটল, কিন্তু গুল্মবনের কোনো চিহ্নই নেই।··· খোলা একটা ডাঙ্গার ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে চলল ভ্লাদিমির, চারিদিকে তার গভীর সব নালা কাটা। তুষার ঝঞ্ঝা তখনো কমেনি, আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘোড়াটা কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বারবার কোমর পর্যন্ত বরফে ডুবে যেতে হলেও ভ্লাদিমির গলগল করে ঘামতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ভ্লাদিমির টের পেলে সে এতক্ষণ ভুল দিকে গাড়ি হাঁকিয়েছে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে এবার চিন্তায় পড়ল। মনে মনে নানা রকম হিসেব করে অবশেষে তার মনে হল বোধ হয় তার ডান দিকে বাঁক নেওয়া উচিত ছিল। ডানদিকেই সে এবার মোড় নিলে। ঘোড়াটার নড়ার শক্তি আর প্রায় নেই। পথে কেটেছে প্রায় এক ঘণ্টা। সুতরাং জাদ্রিনো খুব দূর হওয়ার কথা নয়। অথচ গাড়ি সে হাঁকিয়েই চলল, ডাঙ্গাটার শেষ আর পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল তা শুধু মধ্যে মধ্যে বরফের স্তূপ আর নালা। স্লেজটা ক্রমাগত ওলটাতে লাগল, আর ক্রমাগত তাকে ঠিক করে নিতে হল। এদিকে সময় পুরিয়ে আসছে—ভ্লাদিমিরের মন ভরে উঠল তীব্র উদ্বেগে।

শেষ পর্যন্ত এক কোণে কালো মতো কিছু একটা নজরে পড়ল। সেই দিকেই ঘোড়া হাঁকালে ভ্লাদিমির। কাছাকাছি এসে দেখলে একটা গুল্মবন। ভাবলে ঈশ্বরের কৃপায় বোধ হয় সে এবার জাদ্রিনোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। বনটা পেরিয়ে গাড়ি হাঁকালে ভ্লাদিমির। বনটার ঠিক পরেই জাদ্রিনো। আশা ছিল হয় সে এবার তার চেনা রাস্তাটা পাবে, নয়তো বনটাকে বেড় দিয়ে তাকে খানিকটা যেতে হবে। রাস্তাটা পেতে দেরিও হল না। দুপাশে তার গাছ—শীতে পাতা ঝরে গেছে তাদের। এই গাছের সারির তলা দিয়েই অন্ধকারে হাঁকিয়ে চলল ভ্লাদিমির। হাওয়ার ঝাপটা এখানে আসতে পারছিল না। রাস্তাটাও বেশ পরিষ্কার। ঘোড়াটা নতুন জোর নিয়ে আবার ছুটল। আর এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ভ্লাদিমির।

কিন্তু গাড়ি চলল তো চললই—জাদ্রিনোর দেখা নেই, গুল্মবনটারও যেন শেষ নেই। সভয়ে সে টের পেলে যে একটা অচেনা জঙ্গলের মধ্যে সে এসে পড়েছে। হতাশ হয়ে সে চাবুক হাঁকাতে শুরু করল। বেচারা জানোয়ার চেষ্টা করলে কদমে ছুটতে কিন্তু শীগগিরই নেতিয়ে পড়ল এবং হতভাগ্য ভ্লাদিমিরের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও হেঁটে চলার বেশি কিছুই তাকে দিয়ে করানো গেল না।

অবশেষে বনটা একসময় পাতলা হয়ে এল। ভ্লাদিমির বন থেকে বেরিয়ে এল বটে কিন্তু জাদ্রিনোর কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। মনে হল সময়টা প্রায় দুপুর রাত। গাল বেয়ে তখন তার চোখের জল নামতে শুরু করেছে। এলোপাতাড়ি গাড়ি হাঁকাতে লাগল ভ্লাদিমির। ঝড় থেমে গেছে, মেঘও কেটে গেছে। সামনে পড়ে আছে শুধু একটা তরঙ্গায়িত শাদা বরফের

গালিচায় ঢেকে যাওয়া সমতল প্রান্তর। রাতটা মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। অনতিদূরে ভ্লাদিমিরের চোখে পড়ল একটা বসতি—মাত্র গুটিকয় কুটিরের একটা ঝাঁক। ভ্লাদিমির এবার সেইদিকে স্লেজ হাঁকালো। প্রথম কুঁড়েটার কাছে পোঁছনো মাত্র সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল জানলার কাছে। জানলায় ধাক্কা দিতে খানিক বাদে কাঠের খড়খড়ি তুলে একটা বুড়ো তার পাকা দাড়িওয়ালা মুখটা বার করে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?' 'বলতে পারো, জাদ্রিনো এখান থেকে কতো দূর?' 'কি বললে, জাদ্রিনো কতো দূর?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ কতো দূর?' 'খুব দূর নয়, তবে প্রায় দশ ভার্স্ট।' উত্তর শুনে মাথার চুল ছিঁড়ে বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়াল ভ্লাদিমির, যেন এইমাত্র সে তার ফাঁসির হুকুম শুনল।

'তা তুমি কোথা হতে আসছ গো?'—বুড়ো লোকটা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু জবাব দেবার মতো শক্তিও যেন আর ভ্লাদিমির খুঁজে পাচ্ছিল না। বললে, 'জাদ্রিনো যাবার জন্যে একটা ঘোড়া জোগাড় করে দিতে পারো বুড়ো?' চাষীটা বললে, 'আমাদের ঘোড়া থাকলে তো!' 'তা হলে অন্তত রাস্তাটা দেখিয়ে দেবার জন্যে কাউকে আমার সঙ্গে দিতে পারো? সে যা চাইবে দেবো।' খড়খড়ি বন্ধ করে বুড়ো বললে, 'খানিক দাঁড়ালে তাহলে আমার ব্যাটাই যাবে।' ভ্লাদিমির অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু ৷মনিট খানেক সময় কাটতে না কাটতেই আবার জানলা ধাক্কা দিলে। খড়খড়ি তুলে দাড়িওয়ালা মুখটা আবার বেরিয়ে এল, 'কী চাই গো আবার?' 'কই, তোমার ব্যাটা কোথায়?' 'আসছে গো, বুট পরছে। হিম লাগছে তো ঘরে খানিক আগুন পুইয়ে লিন ক্যানে।' 'না, না, দরকার নেই—তোমার ব্যাটাকে একটু জলদি করতে বলো।'

অবশেষে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে জোয়ানবয়সী একটা ছোঁড়া বেরিয়ে এল। আগে আগে চলল, কখনো পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল, কখনো-বা প্রবল তুষার-পাতের নিচে ঢাকা-পড়া রাস্তাটা খুঁজে বার করার জন্যে ও থেমে পড়ছিল। ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কটা বেজেছে বলতে পারো?' জোয়ান ছোঁড়াটা জবাব দিয়েছিল 'ক্যানে, আর খানিক বাদেই তো সব ফরসা হয়ে যাবে।'—তারপর আর একটা কথাও ভ্লাদিমির উচ্চারণ করেনি।

ওরা যখন জাদ্রিনো পেঁাছল তখন মোরগ ডাকছে, চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে। দেখা গেল গীর্জাটায় তালা দেওয়া। ভ্লাদিমির ছোঁড়াটার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ছুটল পুরোহিতের বাড়ি। আঙিনায় ত্রয়কা গাড়িখানার কোনো চিহ্ন নেই। আর কী সংবাদই না তাকে শেষকালে শুনতে হল!

কিন্তু এবার নেনারাদভোর মাননীয় কর্তাদের কাছে ফেরা যাক এবং দেখা যাক সেখানে কী হচ্ছে।

কী আবার হচ্ছে, কিছুই না।

সকালে ঘুম ভেঙে কর্তাগিন্নী এসে বসলেন তাঁদের বৈঠকখানায়। গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচের গায়ে ফ্লানেলের কুর্তা, মাথায় নাইট ক্যাপ। প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভনা পরেছেন একটা বালাপোষের পোষাক। সামোভার নিয়ে আসা হল। মারিয়া গাভ্রিলভনা কেমন আছে, রাতে ঘুমিয়েছে কেমন জেনে আসার জন্যে গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ একটা চাকরানিকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। সে ফিরে এসে জানাল দিদিমণির ঘুম ভালো হয়নি, কিন্তু এখন একটু ভালো বোধ করছেন, এখুনি বৈঠকখানায় আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়

দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে মারিয়া গাভ্রিলভনা প্রথা-মাফিক মা-বাপকে প্রীতি সম্ভাষণ জানালে।

গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'মাথার যন্ত্রণাটা এখন কেমন মাশা?' মাশা বললে, 'একটু ভালো, বাবা'। প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভনা বললেন, 'ও নিশ্চয়ই হয়েছিল ঐ চুল্লীটার জন্যে'। মাশা উত্তরে বললে, 'বোধহয় তাই হবে'।

সারাদিন আর কিছু ঘটল না, কিন্তু রাত্রে মাশার জ্বর এল। পাশের শহর থেকে একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। সে এসে পৌঁছল পরদিন সন্ধ্যায়—রোগী তখন ভুল বকতে শুরু করেছে। অসুখটা বেশ ভারি রকমের হয়ে উঠেছিল। দুই সপ্তাহ ধরে হতভাগিনীকে নিয়ে টানাটানি চলল যমে-মানুষে।

মেয়েটি যে পালাবার মতলব করেছিল তা বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। আগের দিন সন্ধ্যায় লেখা চিঠিপত্রগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। মাশার ঝিটিও কর্তার ক্ষেপে ওঠার ভয়ে কারো কাছে একটা কথাও ফাঁস করেনি। পুরোহিত, অবসর নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসারটি, মোচওয়ালা কানুনগো আর তরুণ উল্‌হান কোন কারণবশত চুপ করে ছিল। মাতাল অবস্থাতেও কোচোয়ান তেরেশ্‌কার মুখ ফস্‌কে একটা ফালতু কথাও বেরোয়নি। সুতরাং কেবল গণ্ডা-দেড়েক চক্রীর কাছেই মাত্র যা জানা ছিল, তা গোপনই ছিল। কিন্তু মারিয়া গাভ্রিলভনা তার অশান্ত ভুল বকুনির মধ্যে নিজেই তা ফাঁস করে দিলে। তবে ভুল বকুনিটা এতই অস্পষ্ট রকমের হত যে মাশার মা বিশেষ কিছু বোঝেননি। ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের রোগশয্যা

ছেড়ে নড়তেন না। ভুল বকুনির মধ্যে থেকে তিনি শুধু এইটুকু টের পেলেন যে তাঁর মেয়ে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচের প্রতি একান্ত অনুরক্তা এবং রোগটার উৎপত্তি সম্ভবত এই প্রেমের কারণেই। এ নিয়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে এবং কিছু পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গেও আলাপ করে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই একমত হয়ে ঠিক করলেন, এ বোধ হয় বিধাতারই নির্বন্ধ। কপাল কেই বা খণ্ডাতে পারে? তাছাড়া গরিব হওয়া তো আর অপরাধ নয়। মেয়ে তো আর টাকার থলির সঙ্গে ঘর করবে না, ঘর করবে মানুষের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। যা করে ফেলা হয়েছে তা সমর্থনের মতো যুক্তি যখন পাওয়া যায় না তখন চালু আপ্তবাক্যগুলো খুব কাজ দেয় বৈকি।

ইতিমধ্যে মেয়েটি ধীরে ধীরে সেরে উঠল। গাব্রিলা গাব্রিলভিচের বাড়িতে অনেকদিন থেকেই ভ্লাদিমিরের আসা যাওয়া ছিল না। যে রকমের অভ্যর্থনা সে আগে পেয়েছে তাতে এখানে আসার সাহস তার হয়নি। এবার যেচে গিয়ে তাকে ডেকে পাঠানো হল, অপ্রত্যাশিত সুখের সংবাদটিও সে পেলে—বিয়েতে কর্তারা সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু এ নিমন্ত্রণের জবাবে যে অর্ধোন্মাদ একটা চিঠি এসে পৌঁছল তা দেখে নেনারাদভোর কর্তাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। চিঠিতে ভ্লাদিমির আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিল এ বাড়ির কপাট সে আর মাড়াবে না, হতসুখ এই দুর্ভাগার কথা যেন ওঁরা ভুলে যান, মৃত্যু ছাড়া ওর আর কোনো গতি নেই। দিন কয়েক পরে শোনা গেল লোকটা সৈন্যদলে ফিরে গেছে। সময়টা তখন ১৮১২ সাল।

অসুখ থেকে সেরে উঠছে বলে ব্যাপারটা মাশাকে দীর্ঘদিন জানানো হয়নি। সে নিজেও কখনো ভ্লাদিমিরের কথা তোলেনি। শুধু মাস কয়েক পরে, বোরোদিনোর যুদ্ধের পর সাহসের জন্যে পুরস্কৃত ও মারাত্মক আহতদের তালিকায় ভ্লাদিমিরের নাম দেখে মাশা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। ভয় হয়েছিল অসুখটা বুঝি আবার চেগে ওঠে। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মূর্ছাটা খারাপের দিকে আর যায়নি।

কিছুদিন যেতে না যেতে কিন্তু নতুন একটা শোকের ঘটনা ঘটল। মাশার বাবা ইহধাম ত্যাগ করলেন। গোটা সম্পত্তির মালিক হল এখন মাশা—কিন্তু তাতে তার কোনো সান্ত্বনা ছিল না। প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভনার দুঃখে সেও আন্তরিকভাবে ভাগ নিতে চাইলে এবং শপথ করলে, মাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। দুঃখের স্মৃতি ঘেরা নেনারাদভো গ্রাম ছেড়ে তারা গিয়ে বসবাস শুরু করলে মহালেরই আর একটা গ্রাম 'ক'-এতে।

এখানেও সুন্দরী ধনীকন্যার চারপাশে পাণিপ্রার্থীর অভাব ঘটল না। কিন্তু মাশার দিক থেকে কেউ এতটুকু উৎসাহ দেখল না। মেয়েটি যাতে তার জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয় সেজন্য মা মাঝে মাঝে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু মারিয়া গাব্রিলভনা তাতে শুধু তার মাথা নেড়ে কি এক চিন্তায় ডুবে যেত। ভ্লাদিমির বাঁচেনি। ফরাসীরা যখন মস্কো প্রবেশ করে তার ঠিক আগেই সে মারা যায়। মাশার কাছে ওর স্মৃতি ছিল পবিত্র, অন্তত তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এমন যা-কিছু সে পেয়েছে তাই সে সযত্নে জমিয়ে রেখেছিল—যে বইগুলো সে একসময় পড়ত, তার আঁকা ড্রইং, যে-সব কবিতা আর স্বরলিপি সে মাশার জন্যে নকল করে দিয়েছিল, সব।

প্রতিবেশীরা তার এই নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সতী আর্টেমিস্‌টির করুণ সতীধর্ম শেষপর্যন্ত কোন নায়কের কাছে হার মানে তা দেখার জন্যে তারা অপেক্ষা করে রইল সাগ্রহে।

এদিকে যুদ্ধে আমাদের জয় হল। বিদেশের নানা জায়গা থেকে সৈন্যদল ফিরতে শুরু করলে দলে দলে। লোকে ঘর থেকে ছুটে ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের দেখত। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে রপ্ত করে আনা সঙ্গীত বাজাত আমাদের বাজনদার বাহিনীগুলো—'ভিভ্‌ আঁরি কোয়ার্ত্‌', তিরোলিজ ওয়াল্‌জ্‌, কিংবা 'লা জোকোঁদ্‌'-এর এক-একটা সুর। অভিযানে যারা গিয়েছিল কিশোর বয়সে, সে-সব অফিসাররা ফিরল যুদ্ধের আবহাওয়ায় সাবালক হয়ে, বুকে তাদের পুরস্কারের ক্রশ ঝোলানো। সেপাহিরা খোশ-মেজাজে আলাপ করে চলত নিজেদের মধ্যে, কথায় তাদের অতি স্বচ্ছন্দে ফরাসী আর জার্মান শব্দের মিশেল ঘটত। গৌরব আর উদ্দীপনার কি দিনই গেছে সে সব। 'মাতৃভূমি' শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র সেদিন কী প্রবল আবেগেই না রুশীয়দের বুক ভরে উঠত। কী মধুর সেই পুনর্মিলনের অশ্রু। জাতীয় গৌরবের সঙ্গে জারের প্রতি ভালোবাসা সেদিন কীরকম এক হয়ে আমরা মিলিয়ে নিয়েছিলাম—জারের কাছে সে এক দিনের মতো দিনই বটে।

মেয়েরা, রাশিয়ান মেয়েরা, সেদিন হয়ে উঠেছিল অতুলনীয়। কোথায় ভেসে গেল তাদের স্বাভাবিক সঙ্কোচ। বিজয়ীদের ফিরতে দেখে তখন,

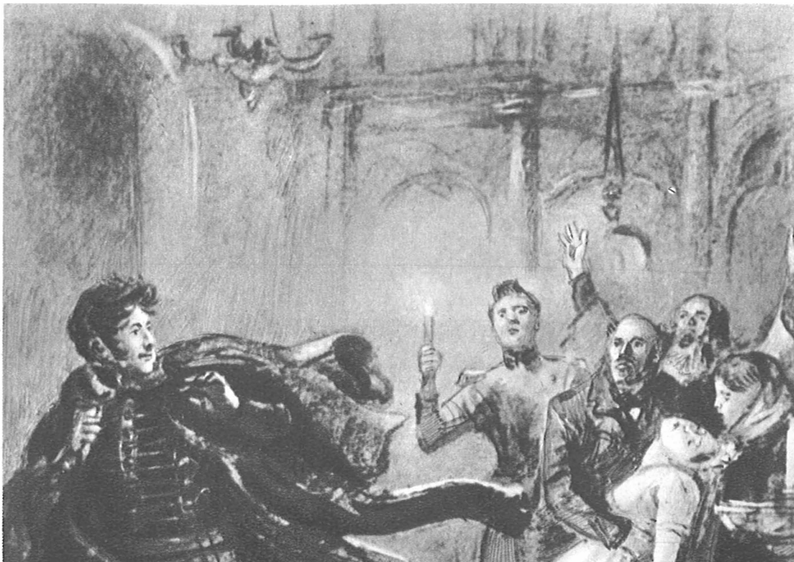
'মেয়েরা সোল্লাসে দেয় ধ্বনি
ওড়না উড়িয়ে দেয় বাতাসে।'[৮]

তখন সে কী উল্লাস আর উত্তেজনা!

সে সময়কার এমন কোনো অফিসার নেই যিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কারটির জন্যে কোনো রুশ নারীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবেন না।

এই সময় মারিয়া গাভ্রিলভনা বাস করছিল তার মার সঙ্গে 'ক' প্রদেশে। সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানী দুটিতে কি উৎসব হয়েছিল তা দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। কিন্তু উদ্দীপনার ব্যাপকতা যে মফস্বল আর গ্রামগুলোতে আরো বেশি হয়েছিল তা বেশ বলা যায়। এই সব এলাকায় কোনো অফিসার এসে পৌঁছলে আর কথা নেই—যেন রাজ সমারোহ শুরু হয়ে যেত, আর ফ্রককোট-পরা লোকটি যদি একটু প্রেমিক-গোছের হত তো আর রক্ষা থাকত না।

আগেই বলেছি, মারিয়া গাভ্রিলভনার দিক থেকে কোনো রকম উষ্ণতার অবকাশ না থাকলেও তার চারপাশে পাণিপ্রার্থীর ভিড় লেগেই ছিল। কিন্তু এবার সকলকেই পিছু হটতে হল যখন বুরমিন নামে এক জখম ঘোড়সওয়ার-কর্ণেল বুকের ওপর জ্বলজ্বলে একটা সেণ্ট্ জর্জ ক্রশ নিয়ে মারিয়া গাভ্রিলভনার দুর্ভেদ্য কেল্লায় উপস্থিত হলেন। লোকটার মুখের রঙে এমন একটা বিবর্ণতা, যা, স্থানীয় তরুণীদের মতে, ভারি মন টানে। বয়স প্রায় তার ছাব্বিশ,—তার নিজের জমিদারিটা, মারিয়া গাভ্রিলভনার জমিদারির খুব কাছেই, সেখানেই সে চলছিল ছুটি কাটাতে। লোকটার প্রতি মারিয়া গাভ্রিলভনা বেশ খানিকটা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুরু করলে। ওর কাছে সে যখন থাকত তখন দেখা যেত মারিয়া



গাব্রিলভনার স্বাভাবিক বিষাদ কেটে গিয়ে খানিকটা সজীবতা ফিরে এসেছে। এর মধ্যে মারিয়া গাব্রিলভনার দিক থেকে ছেনালীপনার এতটুকু কোনো লক্ষণ ছিল না বটে, কিন্তু কবি তাকে দেখে নিশ্চয়ই বলতেন:

Se amor non è, che dunche?*...

বুরমিন সত্যিই মন কাড়ার মতো যুবক। মেয়েদের যা পছন্দ বুরমিনের মনটা ছিল একেবারে সেই রকম—শোভন স্বভাব, মনোযোগী, কথাবার্তার চালিয়াতি নেই, আর সব কিছুতেই একটু স্বচ্ছন্দ রহস্যের আমেজ। মারিয়া গাব্রিলভনার সঙ্গে সে সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহারই করত বটে, তবে মারিয়া গাব্রিলভনা যা কিছু বলত, যা কিছু করত তা থেকে সে তার মন আর চোখ ফেরাতে পারত না। দেখে মনে হত লোকটা ভারি শান্ত এবং সংযমী। কিন্তু শোনা গেল নাকি সে এক সময় বেদম বেপরোয়ার মতো দিন কাটিয়েছে। তাতে অবশ্য মারিয়া গাব্রিলভনার চোখে সে খাটো হল না। অধিকাংশ তরুণীর মতো সে সব কীর্তি-কেলেঙ্কারি তার কাছেও মনে হল সাহস আর হৃদয়ের উদ্বেলতার লক্ষণ, সুতরাং সানন্দে তা সে ক্ষমা করে নিলে।

ঘোড়সওয়ার বাহিনীর এই যুবকটি তাকে কখনো প্রেম নিবেদন করেনি। আর বিশেষ করে এই জন্যেই তার শোভন আদব-কেতা, তার সুন্দর আলাপ আলোচনা, তার মনোহর বিবর্ণতা, তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাহু, এ সব কিছুর চাইতেও বেশি করে এই নীরবতার জন্যেই মারিয়া গাব্রিলভনার কৌতূহল আর কল্পনা আলোড়িত হয়ে উঠল। সে টের পেয়েছিল, মানুষটার ওপর তার একটা ছাপ পড়েছে।

---

* যদি প্রেম না হয় তবে কী···? বিখ্যাত ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কবিতা। তাঁর জন্ম: ১৩০৪, মৃত্যু: ১৩৭৪।

বুরমিনের যা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা, তাতে সেও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে মারিয়া গাভ্রিলভনাও তার প্রতি মোটেই উদাসীন নয়। তাহলে এখনো কেন তাকে মারিয়া গাভ্রিলভনার পদতলে এসে প্রেম নিবেদন করতে দেখা গেল না? কি জন্যে সে পিছিয়ে থাকছে? সেকি সেই শঙ্কার জন্যে, অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে যা সব সময় জড়িয়ে থাকে? নাকি তার অহঙ্কারের জন্যে? নাকি এ শুধু এক নিপুণ নাগরের চতুরালি মাত্র? মারিয়ার কাছে লোকটা হয়ে উঠল এক দুর্বোধ্য রহস্য। অনেক ভেবে মারিয়া গাভ্রিলভনা স্থির করলে এ সংযমের একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই সংকোচ। তাই ওকে সাহস দেবার জন্যে মারিয়া গাভ্রিলভনা আরো খোলাখুলি ভাবে ওর দিকে নজর দিতে শুরু করলে। আর সুযোগ পেয়ে গেলে এমনকি দরদ প্রকাশ করতেও ভুললে না। এমন একটা উপলক্ষ্য সে রচনা করতে চাইছিল যা হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়ে দেখা দেবে। অধৈর্য হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল সেই মুহূর্তের জন্যে যখন রোমান্টিক ঘোষণা সে শুনবে। যে-কোন রকমেরই হোক না কেন, যা রহস্যময় মেয়েদের কাছে তা চিরকালই অসহ্য। মারিয়া গাভ্রিলভনার এই সব মহড়া ব্যর্থ হল না, বুরমিন এমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠতে লাগল, তার কালো চোখজোড়া এমন গভীরভাবে মারিয়া গাভ্রিলভনার মুখের দিকে চাইতে শুরু করলে যে মনে হল চূড়ান্ত মুহূর্তটা বুঝি আসে। পাড়াপড়শীরা পর্যন্ত বিয়ের কথা নিয়ে এমনভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগল যেন ব্যাপারটা সব ঠিকই হয়ে আছে। আর স্নেহাতুরা প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভনা খুশি হয়ে ভাবলে এতদিনে তাহলে মেয়ের রাজজোটক বর জুটল।

একদিন বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁর বৈঠকখানায় বসে বসে 'গ্রাঁদ পেশেন্স' খেলার জন্যে তাস বাঁটছেন এমন সময় বুরমিন এসে জিজ্ঞেস করলে, মারিয়া গাভ্রিলভনা কোথায়। বৃদ্ধা বললেন, 'ও তো বাগানে রয়েছে। যাওনা তুমি। তোমরা দুটিতে না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই একটু বসে থাকি।' বুরমিন চলে গেল আর বুড়ি তার বুকের ওপর ক্রুশের চিহ্ন এঁকে ভাবলেন, 'ভগবান করুন, আজই তাহলে পাকা কথাটা হবে'।

বুরমিন গিয়ে দেখলে মারিয়া গাভ্রিলভনা বসে আছে একটা পুকুরের পাড়ে, উইলো গাছের নিচে, হাতে তার একখানা বই, পরনে শাদা পোশাক, দেখে মনে হবে ঠিক যেন উপন্যাসের কোনো নায়িকা। মামুলী জিজ্ঞাসাবাদটুকুর পর মারিয়া গাভ্রিলভনা ইচ্ছে করেই আলাপ-আলোচনায় ছেদ টেনে চুপ করে রইল, তাতে পরস্পরের অস্বস্তির ভাবটা এমনভাবে বেড়ে ওঠার কথা যে আকস্মিক মরীয়া একটা ঘোষণা দিয়েই তার অবসান ঘটানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যা ঘটল তা এই। বুরমিন তার বিব্রত অবস্থাটার চাপে অস্থির হয়ে বললে, অনেকদিন থেকে সে তার হৃদয় মেলে ধরার একটা সুযোগ খুঁজছিল, মারিয়া গাভ্রিলভনা কি তার কথা একটু শুনবে? মারিয়া গাভ্রিলভনার যে তাতে আপত্তি নেই একথা বোঝাবার জন্যে সে তার বইটি বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বুরমিন বললে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি মারিয়া গাভ্রিলভনা, কী ভয়ানকই না ভালোবাসি!' (মারিয়া গাভ্রিলভনার মুখ লাল হয়ে উঠল। মাথাটা তার আরো ঝুঁকে এল মাটির দিকে।) 'তোমাকে রোজ দেখতে আসা, রোজ তোমার কথা শোনার মধুর এই আকর্ষণে ভেসে যাওয়া আমার

ঠিক হয়নি…' (মারিয়া গাভ্রিলভনার মনে হল সেণ্ট প্রু-র প্রথম পত্রের কথা*।) 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার, নিয়তিকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তোমার স্মৃতি, তোমার অতুলনীয় মধুময় ছবি এখন থেকে আমার সারা জীবনের আনন্দ আর সারা জীবনের বেদনা হয়ে রইল। খুব কষ্টের একটি কর্তব্য আমার বাকি আছে। তোমার কাছে আমার জীবনের একটা মারাত্মক গোপন বিষয় আমায় খুলে বলতে হবে, তাতে তোমার আমার মিলনের মাঝখানে একটা দুস্তর বাধা এসে দাঁড়াবে…' মারিয়া গাভ্রিলভনা অধৈর্যের মতো বাধা দিয়ে বললে, 'সেরকম দুস্তর বাধা সব সময়েই থাকে… তোমার স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হত না…' 'জানি'—বুরমিন বললে কোমল করে, 'আমি জানি তুমি আর একজনকে ভালোবাসতে। কিন্তু মৃত্যু আর তারপর এই তিনবছর ধরে শোকের পর… প্রিয়তমা মারিয়া গাভ্রিলভনা, আমার একমাত্র সান্ত্বনা তুমি দয়া করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। যখন ভাবি, আমার সুখ পূর্ণ করে তুলতে অমত করতে না, যদি… না, না, কথা কোয়ো না, মারিয়া গাভ্রিলভনা। তোমার জন্যে কী যন্ত্রণা যে সইতে হচ্ছে। আমি জানি, আমি বুঝতে পারি তোমায় আমি পেতে পারতাম, কিন্তু আমি বড়ো হতভাগ্য, মারিয়া গাভ্রিলভনা—আমি বিবাহিত।'

মারিয়া গাভ্রিলভনা হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

---

* রুশো লিখিত 'নিউ এলইসা' উপন্যাসের নায়ক সেণ্ট প্রু-র পত্রের কথা।

বুরমিন বললে, 'আমি বিবাহিত। আজ চার বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমি জ্যান না কে আমার স্ত্রী, কোথায়ই বা সে আছে, আদৌ তার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হবে কিনা।'

'কী বললে?' মারিয়া গাাব্রলভনা চেঁচিয়ে উঠল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার—আমিও তোমায় কিছু বলব, কিন্তু আগে তোমারটা শুনি, বলো তো সবখানি…'

বুরমিন বললে, '১৮১২ সালের গোড়ার দিকে আমি যাচ্ছিলাম ভিলনোর দিকে। বেশ তাড়া ছিল। আমাদের রেজিমেণ্ট ছাউনি ফেলেছিল সেখানে। একটা ডাক স্টেশনে এসে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমি হুকুম দিলাম জলদি করে আমার জন্যে ঘোড়া জুততে। এমন সময় একটা তুষার ঝঞ্ঝা শুরু হয়ে গেল। ডাক স্টেশনের কর্তা আর গাড়োয়ানেরা সকলেই বললে, ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। প্রথমটা ওদের কথা শুনে অপেক্ষা করলাম খানিকটা, কিন্তু কেমন অদ্ভুত একটা উদ্বেগ আমায় পেয়ে বসল। মনে হল ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে তাড়া দিচ্ছে। ওদিকে ঝড়ের দাপট কমারও কোনো লক্ষণ নেই। অধৈর্য হয়ে আবার ঘোড়া জুততে হুকুম দিলাম আর ঝড় মাথায় করেই বেরিয়ে পড়লাম। কোচোয়ান কি ভেবে নদীর পাড়ের পথ ধরলে; তাতে নাকি তিন ভার্স্ট পথ বাঁচবে। নদীর পাড় সব কিন্তু বরফে ঢেকে গিয়েছিল। ফলে রাস্তার যে মোড়ে আমাদের বাঁক নেওয়ার কথা তা আমরা পেরিয়ে চলে গেলাম। যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেটা এক অপরিচিত জায়গা। তখনো ঝড় কমার কোনো লক্ষণ নেই। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকেই গাড়ি হাঁকাতে বললাম। গিয়ে

দেখা গেল, জায়গাটা একটা গাঁ, কাঠের একটা গীর্জার ভেতরে আলো জ্বলছে। গীর্জার দরজা খোলা, বেড়ার ভেতর দিকে কয়েকটা স্লেজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার ওপর জনকয়েক লোক পায়চারি করছিল। আমাকে দেখে একসঙ্গে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, "এই দিকে, এই দিকে!" কোচোয়ানকে বললাম গীর্জার বেড়ার ভেতর ঢুকতে। কে একজন বললে, "কী ব্যাপার, এত দেরি করলে কি বলে? কনে মূর্ছা গেছে। পুরোহিত ভেবে পাচ্ছে না কি করা উচিত। আমরা তো বাড়িই ফিরে যাচ্ছিলাম্। শীগগির এসো।" দ্বিরুক্তি না করে আমি স্লেজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে ঢুকলাম গীর্জার ভেতরে। কয়েকটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে, তাতে আবছা একটু আলো হয়েছে। অন্ধকার এক কোণে একটি তরুণী বসে আছে বেঞ্চিতে, আর একটি মেয়ে তার কপাল টিপে দিচ্ছে। সে মেয়েটি বললে, "ভগবান বাঁচিয়েছেন। খুব সময়ে এসে পড়েছেন যা হোক। দিদিমণিকে আর একটু হলেই মেরে ফেলতেন আর কি।" বুড়ো মতো একজন পুরোহিত এসে জিজ্ঞেস করলে, "তা হলে শুরু করা যাক?" অন্যমনস্কভাবে আমি বললাম, "করুন, ফাদার, শুরুই করুন।" মেয়েটিকে ধরাধরি করে এনে দাঁড় করানো হল। মনে হল সে বেশ সুন্দরী হবে··· ব্যাপারটা এমন একটা যুক্তিহীন, ক্ষমার অযোগ্য চ্যাংড়ামি হয়েছিল··· আমি বেদীর সামনে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরোহিত তাড়াহুড়ো করছিল। তিনটে লোক আর ঝি-টি মেয়েটিকে ধরে রাখতেই ব্যস্ত ছিল—অন্য কোনোদিকে তাদের নজর ছিল না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীরূপে ঘোষণা করা হল। ওরা বললে, 'এবার চুমু খেতে হবে'। আমার স্ত্রী তার বিবর্ণ মুখখানাকে আমার দিকে

উঁচু করে তুলে ধরলে। আমি চুমু খেতে যাবো এমন সময় মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, "এ নয়, এ নয়!" তারপর পড়ে গেল অচৈতন্য হয়ে। সাক্ষীরা আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইতে শুরু করলে। আমি অবিচলিতের মতো ফিরে চলে এলাম গীর্জা ছেড়ে। স্লেজের ওপর লাফ দিয়ে উঠে হাঁকলাম, "চালাও!"'

মারিয়া গাভ্রিলভনা চিৎকার করে উঠল, 'মাগো! তারপর তোমার বেচারী বৌটির কি হল? তার কোনো খোঁজই রাখলে না?'

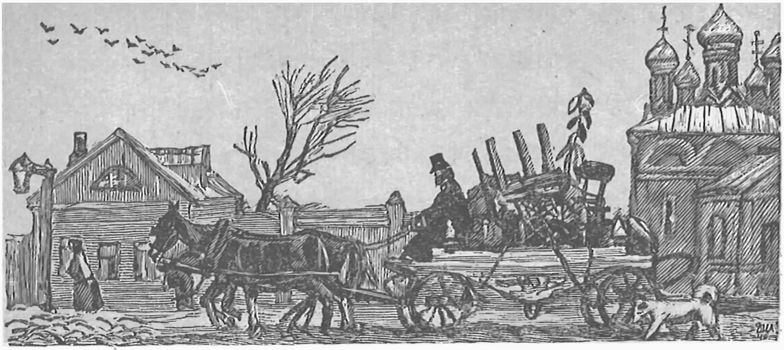
বুরমিন বললে, 'না। যে গাঁয়ে বিয়ে হল তার নামটা পর্যন্ত জানা নেই। কোন ডাক-স্টেশন থেকে যে আমি রওনা দিয়েছিলাম তাও খেয়াল নেই। সে সব দিনে গর্হিত এই ধরণের রগড় সম্পর্কে আমার এতটুকু দায়িত্ববোধ ছিল না। গীর্জাটা পেছনে সরে যাওয়া-মাত্র আমি স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর সে ঘুম ভাঙে মাত্র পরদিন সকালে, তৃতীয় ডাক-স্টেশনে আসার আগে। আমার সঙ্গে যে-ভৃত্য ছিলো লড়াইতে তার মৃত্যু হয়। ফলে যাকে নিয়ে অমন নিষ্ঠুর তামাসা করেছিলাম এবং এখন যে এত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিলো, তাকে খুঁজে বার করার আশা আমার নেই।'

'মাগো!' মারিয়া গাভ্রিলভনা বুরমিনের জামার আস্তিনটা আঁকড়ে ধরে বললে, 'তা হলে সে ব্যক্তিটি তুমিই—অথচ আমাকে চিনতে পারলে না?

বুরমিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল··· তারপর গিয়ে বসলে মারিয়া গাভ্রিলভনার পায়ের কাছে।

কাফনওয়ালা





যে-দিকে তাকাই সে-দিকে কফিন দেখি
বুড়ো পৃথিবীর পাকা-চুল তারা নাকি?

—দের্জাভিন্ [৯]

কাফন-টানা গাড়িখানার ওপর কাফনওয়ালা আদ্রিয়ান প্রোহোরভের গেরস্তালি জিনিসপত্রের শেষ টুকিটাকিটি পর্যন্ত চাপানো হল। রোগা রোগা ঘোড়াদুটো এই নিয়ে বার বার চারবার কোঁথাতে কোঁথাতে রওনা দিলে বাস্‌মান্নায়া স্ট্রীট থেকে নিকিৎস্কাইয়া স্ট্রীটের দিকে। বাড়ি বদল করে সপরিবারে সে ওখানেই উঠে যাচ্ছে। দোকানে তালা ঝুলিয়ে সে ফটকের মাথায় বিজ্ঞাপন ঝলিয়ে দিলে, 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করা যাইবে' তারপর নতুন বাসার দিকে যাত্রা করলে পায়ে হেঁটে। বাড়িখানার জন্যে তার অনেক দিন থেকেই লোভ ছিল। বেশ মোটা টাকা দিয়ে তা এতদিন পরে কেনা গেছে। তবু এই বহু বাঞ্ছিত বাড়িখানার

হলুদ-রঙা দেয়ালের কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে সে টের পেলে তেমন আনন্দ লাগছে না। বাড়িটার তখনো কোন গোছগাছ করা হয়নি। এখানকার অচেনা চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সেই খুপরিটার জন্যেই যেখানে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে সব কিছুর মধ্যেই ছিল একটা পরিপাটি শৃংখলা। ঢিলেমির জন্যে কাফনওয়ালা ধমক দিলে তার মেয়ে দুটি আর ঝি-টিকে, তারপর নিজেই গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। ঘরখানা গুছিয়ে তুলতে দেরি হল না। ধর্মকর্মের দেবীপট, বাসনপত্রের দেরাজ, টেবিল, কোচ আর শয্যা ভেতর-ঘরের নানা কোণে সকলেই যথাযোগ্য স্থান পেল, গৃহকর্তার যা কিছু সম্পত্তি সব গাদা করা হল রান্নাঘর আর বৈঠকখানায়—নানা রঙ আর নানা গড়নের যতো কাফন, আর আলমারি-ভর্তি শোকের নানা আলখাল্লা, মাথার ঢাকনি, মশাল। ফটকের ওপর টাঙ্গানো হল একটা সাইন-বোর্ড, তাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট এক 'কিউপিড'-মূর্তি আঁকা, উলটিয়ে-ধরা একটা মশাল তার হাতে, নিচে লেখা 'সাধারণ ও চিত্রবিচিত্র নানা প্রকার কাফন বিক্রয় ও সুসজ্জিত করা হয়। কাফন ভাড়া দেওয়া বা মেরামত করার কাজও আমরা করিয়া থাকি।' গোছগাছের পর আদ্রিয়ানের কন্যারা তাদের নিজ নিজ কুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। আর আদ্রিয়ান তার নতুন আবাসখানার চারিদিক আর একবার তদারক করে এসে বসল জানলার পাশে, হুকুম দিলে সামোভার গরম করো।

বিদগ্ধ পাঠকদের জানা আছে যে শেক্স্পীয়র এবং স্যার ওয়ালটার স্কট—উভয়েই কবর খোঁড়নেওয়ালাদের এঁকেছেন এমনভাবে যেন তারা বুঝি খানিকটা অগভীর ও বাচাল প্রকৃতির। এর পেছনে তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৈপরীত্য স্বষ্টি করে গভীরতর ছাপ ফেলা। কিন্তু সত্যের প্রতি অনুগত থাকতে হলে

তাঁদের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে অনুসরণ করা আমাদের সম্ভব হবে না। বলতে আমরা বাধ্য যে আমাদের এই কাফনওয়ালাটির স্বভাব ছিল ঠিক তার বিষণ্ন উপজীবিকারই অনুরূপ। আদ্রিয়ান প্রোহোরভ হল একজন গম্ভীর আর বিমর্ষ ধরণের মানুষ। নিতান্ত দু'একটা ক্ষেত্র ছাড়া তার স্তব্ধতা সহজে ভাঙত না, এবং তাও ভাঙত শুধু সেই সব সময় যখন হঠাৎ তার নজরে পড়ত মেয়ে দুটো জানলার শার্সির মধ্যে দিয়ে আলসের মতো রাস্তার লোকেদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিংবা দুর্ভাগ্যবশত, (অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে সৌভাগ্যবশত), তার হাতের কাজের জন্যে খদ্দের এলে যখন চড়া দাম হাঁকার প্রয়োজন পড়ত। তাই সপ্তম কাপ চা সামনে নিয়ে আদ্রিয়ান বসেই রইল তার জানলার কাছে আর তার অভ্যাসমতো বিষণ্ন নানা চিন্তায় ধীরে ধীরে ডুবে গেল। সে ভাবছিল গত সপ্তাহের সেই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের শবযাত্রাটার কথা। তোলা আদায়ের ফটকটা পার হচ্ছে ঠিক এমন সময় ঝমঝম করে কী বৃষ্টি। তার ফলে আদ্রিয়ানের অনেকগুলো আলখাল্লা চুপসে গেছে, অনেক ক'টা টুপি দুমড়িয়ে গেছে। সামনে তার এক মস্ত খরচ—সৎকার বাসরের যে সব আদিকালের সাজপোশাকগুলো তার গুদামে আছে তাদের অবস্থা একেবারে কাহিল। আশা ছিল এই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে বুড়ি ত্রিউখিনার সৎকার-কর্ম থেকে, ধনী এক কারবারীর বিধবা এই বুড়ির আজ বছরখানেক থেকে প্রায় যায়-যায় অবস্থা। কিন্তু মরলে বুড়ি মরবে সেই রাজগুলিয়াই চত্বরে। সেইজন্যেই প্রোহোরভের দুর্ভাবনা হচ্ছিল, কথা দিয়ে রাখা সত্ত্বেও হয়ত বুড়ির উত্তরাধিকারীরা এতদূর এসে তাকে ডাকতে পাঠাবে না, এবং কাছাকাছি কোনো ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলবে।

সদর দরজায় তিনটি বিশেষ ধরণের টোকায় আদ্রিয়ানের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। 'কে হে?' কাফনওয়ালা জিজ্ঞেস করলে চেঁচিয়ে। দরজা খুলতে একটি লোক ঘরে ঢুকে কাফনওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল ফুর্তির মেজাজে। দেখেই চেনা যায় লোকটা একটা জার্মান কারিগর। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রুশে সে যেভাবে কথা কইছিল তা শুনে হাসি চেপে রাখা মুশকিল। বললে, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মাফ করবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। আমার নাম গট্‌লিব শুলৎস—জুতোর কারিগর। থাকি রাস্তার ঠিক ওপারে—ওই যে ছোটো বাড়িটা, আপনার জানলা থেকেই চোখে পড়বে। আগামী কাল আমার বিয়ের পঁচিশ বছর পালন করতে চাইছি। আপনার আর আপনার মেয়েদের নেমন্তন্ন রইল। ঘরের লোকের মতো একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।' নেমন্তন্ন সাদরে গ্রহণ করা হল। কাফনওয়ালা চা এগিয়ে দিল জুতোর কারিগরটিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গটলিব শুলৎসের দিলখোলা মেজাজের দৌলতে ওদের দুজনের মধ্যে আলাপ জমে উঠল বেশ দোস্তের মতো। 'আপনার কারবারের কী খবর?' আদ্রিয়ান প্রশ্ন করলো। শুলৎস বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ··· আমাদের কারবারেও চড়া মন্দা আছে, তবে আফশোস করে কি হবে। আমার অবিশ্যি আপনার মতো নয়—জ্যান্ত লোকের জন্যে অনেক সময় বুট না কিনলেও চলে, কিন্তু মরা লোকের জন্যে কাফন না নিয়ে উপায় নেই।' আদ্রিয়ান বললে, 'তা বটে। তবে কিনা জ্যান্ত লোকের টাকা না থাকলে সে খালি-পায়েই হাঁটবে. আপনার খরচা করাবে না। কিন্তু টাকা নেই এমন লোক যদি মরে তখন বিনা পয়সাতেই কাফন ছেড়ে দিতে হয়।' এমনি আলাপ চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বিদায়

নেবার সময় হলে জুতোর কারিগর আর একবার তার নেমন্তন্নের কথাটা জানিয়ে গেল।

পরদিন ঠিক দুপুরে সকন্যা কাফনওয়ালা তাদের নতুন কেনা বাড়িটির ফটক খুলে বেরিয়ে এল এবং রওনা দিলে প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। পোশাকের বর্ণনা দেওয়া আজকালের সাহিত্যের একটি প্রচলিত রীতি। এ রীতি লংঘিত হলেও আমি কিন্তু আদ্রিয়ান প্রোহোরভের রুশীয় 'কাফ্‌তান' কিংবা আকুলিনা আর দারিয়ার ইউরোপীয় পোশাকের বর্ণনা দিতে যাবো না। শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয় হবে যে দুই কন্যার পরনেই ছিল সেই হলদে রঙের টুপি আর লাল-রঙের জুতো—বিশেষ উপলক্ষ্য না ঘটলে যেটি ওরা সাধারণত বার করত না।

জুতো-মিস্ত্রির ছোটো ঘরখানা নিমন্ত্রিতে ভরে গিয়েছিল। জার্মান কারিগর আর তাদের বৌ আর তাদের শিক্ষানবিশীরাই তার মধ্যে বেশি। রুশ সরকারী কর্মচারী বলতে ছিল মাত্র একজন—পুলিস চুখোনেৎস* ইউর্কো। পদের দিকে উঁচু না হলেও গৃহকর্তার বিশেষ অনুগ্রহ তার ওপরে ছিল, কেননা পগোরেলস্কির সেই বিখ্যাত পোস্ট্‌ম্যানের [১০] মতো দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে সে অকপট সততার সঙ্গেই কাজ চালিয়ে এসেছে। ১৮১২ সালের অগ্নিকাণ্ডে যখন এই সেকেলে রাজধানী পুড়ে যায় তখন সেই সঙ্গে তার হলুদ-রঙা গুম্‌টি-ঘরটিও যায়। কিন্তু শত্রুদের তাড়িয়ে দেবার পর সে জায়গায় নতুন একটি গুম্‌টি-ঘর উঠতে দেরি হয়নি। এবার তার রং

---

* চুখোনেৎস—রুশ ভাষায় ফিন্‌ জাতির বিদ্রূপের নাম।

করা হল ধূসর আর শাদা থামগুলো করা হল 'ডোরিক' ছাঁদের। আপাদমস্তক সশস্ত্র হয়ে ইউর্কো আবার তার সামনে টহল দেওয়া শুরু করলে। নিকিৎস্কি গেটের চারপাশে যত জার্মান ছিল তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে ইউর্কোর আলাপ ছিল। ওদের কাউকে কাউকে এমনকি তার গুমটি ঘরে গিয়ে রবিবারের সন্ধ্যে কাটাতেও দেখা যেত। সুতরাং ও লোকটাকে দিয়ে ভবিষ্যতে তার কাজ হবে এটা আন্দাজ করে আদ্রিয়ান তার সঙ্গে আলাপ করে নিতে দেরি করলে না। খেতে বসার সময় আদ্রিয়ান আর ইউর্কো বসল পাশাপাশি। অভ্যাগতদের সঙ্গে খেতে খেতেই শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী শুলৎস আর তাদের সতেরো বছরের মেয়ে লট্‌হেন খাওয়ার তদারক করতে লাগল আর মাঝে মাঝে পরিবেশনের ব্যাপারে পাচককে সাহায্য করতে শুরু করলে। বিয়ারের বান ডাকল টেবিলে। ইউর্কো একাই সাঁটল চারজনের মতো। আদ্রিয়ানও পিছ-পা হল না এবং তার কন্যাদ্বয় যথারীতি তাদের আদব-কেতা সামলাতেও ব্যস্ত রইল। কথাবার্তা চলছিল জার্মানে এবং ক্রমেই তা সরব হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একসময় গৃহকর্তা সকলকে একটু থামতে বলে উঠে দাঁড়াল এবং আলকাতরার পোঁচ-দেওয়া একটা বোতলের ছিপি খুলে রুশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার আদরের লুইজের স্বাস্থ্যের জন্যে।' হালকা শ্যাম্পেন ফেনাতে থাকল। গৃহকর্তা তার মধ্যবয়সী কর্মসঙ্গিনীর তাজা-তাজা-দেখতে মুখখানার ওপরে চুমু খেলে আর কলরব করতে করতে অভ্যাগতেরা আদরের লুইজের জন্যে স্বাস্থ্য পান করলে। গৃহকর্তা এবার আর একটি বোতল খুলে ঘোষণা করলে, 'আমার প্রীতিভাজন অতিথিদের স্বাস্থ্যের জন্যে।' অতিথিরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধন্যবাদ দিয়ে গেলাসগুলি



আবার শূন্য করে দিলে। তারপর শুরু হল ঘনঘন টোষ্ট-ঘোষণা। স্বাস্থ্য পান করা হল এক এক করে প্রত্যেকটি লোকের জন্যে, মস্কো শহরের জন্যে, গণ্ডা তিনেক জার্মান ছোট শহরের জন্যে, এক-এক করে প্রত্যেকটা পেশার জন্যে এবং একত্রে সব রকমের পেশার জন্যে, এবং তাতে যত কারিগর আর শিক্ষানবিশ আছে তাদের সকলের জন্যে। আদ্রিয়ান বিবেচকের মতোই মদ্য পান করছিল বটে তবু শেষ পর্যন্ত ফূর্তির মাথায় সেও একটা খামখেয়ালী টোষ্ট-প্রস্তাব করে বসল। অতঃপর অতিথিদের মধ্যে থেকে মোটামতো এক রুটিওয়ালা তার গ্লাস উঁচু করে ঘোষণা করলে — 'আমাদের খদ্দেরদের স্বাস্থ্যের জন্যে — unserer Kund-leute! *' আগের টোষ্টগুলোর মতো এ টোষ্টটাও পান করা হল ঐকতান ফূর্তির সঙ্গে। অতিথিরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করতে শুরু করল। দর্জি অভিবাদন করলে জুতোর কারিগরকে, জুতোর কারিগর অভিবাদন করলে দর্জিকে, তাদের দুজনকেই অভিবাদন করলে রুটিওয়ালা, তারপর গোটা দলটাই গিয়ে অভিবাদন করলে রুটিওয়ালাকে, এবং এই-ই চলল। পারস্পরিক এই অভিবাদনের মধ্যে ইউর্কো হঠাৎ কাফনওয়ালার দিকে ফিরে চিৎকার করে বললে, 'এসো ভাই, এবার তোমার মরা-মানুষগুলোর স্বাস্থ্য পান করা যাক!' সকলে হেসে উঠল কিন্তু কাফনওয়ালা হাসল না। আহত বোধ করে সে ভ্রূকুটি করলে। কিন্তু কারোরই তা নজরে পড়ল না, পান চলতে লাগল পুরোদমে। টেবিল ছেড়ে ওরা যখন উঠল তখন সন্ধ্যার ঘণ্টা শুরু হয়েছে।

---

* জার্মান ভাষায় — আমাদের খদ্দেরদের জন্যে।

ফিরতে সকলের বেশ রাত হয়ে গেল। সকলেই বেশ মাতাল হয়েছে। মোটা রুটিওয়ালা আর দপ্তরী যার মুখখানা হয়েছে ঠিক তার লাল-মরক্কোয়-বাঁধান বইয়ের মতো, দুজনে মিলে কনেষ্টবল-পুঙ্গব ইউর্কোর দুই বগলের নিচে দুই হাত দিয়ে ধরে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল গুম্‌টিতে। প্রত্যেকটা দানেরই প্রতিদান মিলবে—এই রুশ প্রবাদ বাক্যটি তারা এক্ষেত্রে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। কাফনওয়ালাও বাড়ি ফিরল বেশ বেসামাল হয়ে। মেজাজ তার চড়ে গিয়েছিল। যেটা তার মনে মনে ভাবার কথা সেটা সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'যাই বলো, আমার পেশা অন্যের চেয়ে কম সম্মানের হল কেমন করে? কাফনওয়ালা আর জল্লাদ তাহলে এক বলতে চাও? এক কি? এ কারবারে হাসির কি আছে, কী পেল ওই পরদেশী লোকগুলো? আমাকে কি ওরা এক আলখাল্লা-পরা সং ঠাউরাল নাকি? আর এদেরকেই কিনা আমি গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করব বলে ভাবছিলাম? ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে বরং আমি যাদের জন্যে মেহনত করি তাদেরই ভোজ দেব—আমার ক্রীশ্চিয়ান মড়াগুলোকেই নেমন্তন্ন করব।'

ঝি বুট খুলে দিচ্ছিল আদ্রিয়ানের। সভয়ে সে বলে উঠল, 'হেই মাগো! কি বলছেন গো কর্তা। ক্রুশ দেন শীগ্‌গির। গৃহপ্রবেশের জন্যে মরা মানুষদের নেমন্তন্ন। মাগো!' 'ভগবানের দিব্যি, তাই-ই করব, আর কালই। আমার উপকারী গ্রাহকেরা, আপনারা শুনুন, যদি কাল আমার বাড়িতে আপনারা নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন গ্রহণ করেন তাহলে বাধিত হব। গরিবের খুদকুঁড়ো যেটুকু আছে তাই ভাগ করে খাওয়া যাবে।' এই বলে কাফনওয়ালা বিছানায় গা এলিয়ে দিল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তার নাক ডাকা।

আকাশ তখনো ফরসা হয়নি এমন সময় আদ্রিয়ানকে জেগে উঠতে হল। রাত্রে কারবারী গিন্নী ত্রিউখিনা মারা গেছে। বাড়ির সরকারের কাছ থেকে একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে খবরটা নিয়ে এসেছে আদ্রিয়ানের কাছে। ভদকা খাবার জন্যে কাফনওয়ালা তাকে দশ কোপেক বখশিস করলে। তারপর তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে দ্রজ্‌কি চেপে রওনা দিলে রাজগুলিয়াই-এর দিকে। মৃতের বাড়িতে ইতিমধ্যেই পুলিস-পাহারা বসানো হয়েছে। ভাগাড়ের কাকের মতো কারবারী ব্যাপারীরা সবাই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। মড়া বার করে এনে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। পচ্‌ ধরে চেহারা এখনো বিকৃত না হয়ে এলেও বুড়ির মুখ হয়েছে মোমের মতো প্যাটপেটে। তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে যতো আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, আর বাড়ির চাকরবাকর। জানলাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, মোমবাতি জলছে, মৃতের জন্যে পুরোহিত প্রার্থনা শুরু করেছেন।

আদ্রিয়ান গিয়ে দাঁড়াল মৃত কর্ত্রীর ভাইপোর কাছে। লোকটা একজন জোয়ান বয়সী কারবারী, গায়ে তার একটা হালফ্যাসনের ফ্রক কোট। আদ্রিয়ান তাকে গিয়ে জানাল সে দাফন, কাফন, মোমবাতি, কাফনের আচ্ছাদনী আর সৎকারের যাবতীয় জিনিসপত্র অবিলম্বে বেশ সরেস অবস্থায় জোগান দিতে পারে। হবু মালিক তাকে অন্যমনস্কের মতো ধন্যবাদ দিয়ে বললে, দাম নিয়ে সে দরাদরি করতে চায় না। কাফনওয়ালার ধর্মের ওপর সে সবই ছেড়ে দিচ্ছে। কাফনওয়ালা তার অভ্যাস মতো দিব্যি গেলে বললে, একটা কোপেকও সে বেশি নেবে না। তারপর বাজার সরকারের দিকে চোখ মটকে একটু তাকিয়ে জোগাড় যন্ত্র করার জন্যে চলে গেল

গাড়ি হাঁকিয়ে। সারাদিন ধরে তাকে কেবলি রাজগুলিয়াই আর নিকিৎস্কি গেটের মধ্যে যাওয়া-আসা করে বেড়াতে হল। সন্ধ্যার মধ্যে সব কিছু তৈরি হয়ে যাবার পর, সে কোচোয়ানকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল পায়ে হেঁটে। রাতটা ছিল চাঁদনী। নিকিৎস্কি গেট পর্যন্ত পেঁাছতে কোনো কষ্ট হল না। এসেন্সন গীর্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় শুধু একবার আমাদের সেই বন্ধু ইউর্কো একবার চৌকির হাঁক পেড়েছিল, 'কে যায়?' তারপর শুভরাত্রি জানিয়েছিল আদ্রিয়ানকে চিনতে পেরে। ইতিমধ্যে রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। কাফনওয়ালা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় তার মনে হল কে যেন তার বাড়ির ফটক খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। আদ্রিয়ান অবাক হয়ে ভাবলে 'ব্যাপার কি! আমার কাছে এখন আবার কে আসবে? চোর নাকি? রাতের ফাঁকে আমার ঐ বেকুফ্ ছুকরিদুটোর কাছে জোয়ান ছোঁড়া-ফোঁড়া কেউ আসে না তো আবার?' একবার ভাবলে দোস্ত ইউর্কোকে সাহায্যের জন্যে ডাক দেবে কিনা। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরো একজন কে চলেছে তার ফটকের দিকে। সেও ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় কাফনওয়ালাকে হনহন করে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তার তেকোণা টুপিটা উঁচু করলে। আদ্রিয়ানের মনে হল মুখটা তার চেনা, কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্যে ভালো করে নজর করার সময় তার ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'আমার কাছে আসছিলেন কি? ভেতরে চলুন না।' ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় অচেনা লোকটা বললে, 'আপনি পথ দেখিয়ে আগে চলুন। ভদ্রতার দরকার হবে না।' আদ্রিয়ানেরও এতই তাড়া ছিল যে ভদ্রতা করার অবকাশ ছিল না তার। খোলা ফটক দিয়ে সে

বাড়ির পৈঠায় উঠতে শুরু করলে। লোকটা এল তার পেছু পেছু। আদ্রিয়ানের মনে হল ঘরের মধ্যে আরো যেন সব লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সে ভাবলে, 'শালা ব্যাপার কি এসব?' আর··· ব্যাপার দেখে তার হাঁটু খুলে এল। ঘরখানায় মড়ারা এসে হাজির হয়েছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাদের হলদে নীল চেহারার ওপর, তাদের চুপ্‌সানো মুখ, আধ-বোঁজা মিটমিটে চোখ আর ঠোকরানো নাকের ওপর। যে-সব লোককে কবরস্থ করতে আদ্রিয়ান সাহায্য করেছে এবার সভয়ে তাদের চিনতে পারলে সে। যে লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকেছিল দেখা গেল সে হচ্ছে সেই ব্রিগেডিয়ার যাকে কবর দেবার সময় বৃষ্টি নেমেছিল। কাফনওয়ালার চারপাশে ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা মড়ারা সব ফিরে দাঁড়িয়ে অভিবাদন আর অভিনন্দন জানাতে শুরু করলে। শুধু একজন বিশেষ কাছে এল না—বেচারিকে কিছুদিন আগে কাফন দিতে হয়েছিল বিনা পয়সায়। একটা কোণের কাছে গিয়ে লোকটা সবিনয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন তার ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের কথা ভেবে বড়ো কুণ্ঠিত বোধ করছে। সে ছাড়া আর সকলেরই পোশাক-আশাক বেশ ভালো, মহিলাদের মাথায় ফিতেওয়ালা টুপি, ভূতপূর্ব সরকারা কর্মচারীদের দাড়িগোঁপ কামানো না হলেও গায়ে ইউনিফর্মটি আছে ঠিক, আর কারবারীদের পরনে তাদের সেরা সেরা পোশাকগুলো। গোটা দলটার পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার বললে, 'এই দেখুন প্রোহোরভ, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্যে আমরা সকলেই কবর থেকে উঠে এসেছি। শুধু যাদের আর কোনো উপায় নেই, যারা একেবারেই ক্ষয়ে গেছে কিংবা যারা একেবারেই শুধু কংকাল, তারা আসেনি। তবে এই

কংকালদের মধ্যেকারই একজন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে এতই আগ্রহ বোধ করেছিলেন যে না এসে পারেননি…' সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বকায় একটি কংকাল ভিড়ের মধ্যে থেকে গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে এল আদ্রিয়ানের দিকে। তার মাংসহীন মুখখানা আদ্রিয়ানের দিকে চেয়ে সস্নেহে কটাক্ষপাত করলে। টকটকে লাল আর হালকা সবুজ রঙের ছিটের কিছু টুকরো আর ঝুলিঝুলি সূতী কাপড় কিছু তার গায়ে এখানে ওখানে লেগে আছে যেন একটা লাঠির সঙ্গে তা বাঁধা। উঁচু উঁচু সওয়ারী বুটের মধ্যে তার পায়ের হাড়গুলো খটখট করে বাজছে যেন খল-নোড়ার শব্দ। কংকাল বললে, 'আমায় চিনতে পারছো না প্রোহোরভ? রক্ষী-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট পিওতর পেত্রোভিচ্ কুরিলকিনের কথা তোমার মনে নেই। সেই যাকে তুমি তোমার প্রথম কাফন (তুমি বলেছিলে কাফনটা ওক কাঠের কিন্তু আসলে তা ছিল পাইন কাঠের) বিক্রি করেছিলে ১৭৯৯ সালে?' এই বলে কংকাল তার হাত বাড়িয়ে একটা হাড্ডি-সার কোলাকুলির জন্যে এগিয়ে গেল আদ্রিয়ানের দিকে। কিন্তু আদ্রিয়ান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে তার গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। পিওতর পেত্রোভিচ্ টলতে টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শুধু এক রাশ হাড়ের স্তূপ সৃষ্টি করে। মড়াদের মধ্যে থেকে ক্রোধের গুঞ্জন শোনা গেল। সঙ্গীর সম্মান রক্ষার জন্যে তারা একযোগে এগিয়ে এল এবং সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদ্রিয়ানের ওপর। তাদের সে চিৎকারে বেচারা নিমন্ত্রণ-কর্তা কানে তালা লেগে, হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে, বোধশক্তি খুইয়ে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল ওই সেই রক্ষীবাহিনীর মৃত সার্জেণ্টের হাড়গুলোরই ওপর।

কাফনওয়ালা যখন চোখ মেললে তার অনেক আগে বিছানায় বেশ রোদ এসে পড়েছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে সামোভারে ফুঁ দিয়ে ঝি আঁচ দিচ্ছে। সভয়ে আদ্রিয়ানের মনে পড়ল রাত্রের কথা। ত্রিউখিনা, ব্রিগেডিয়ার আর সার্জেণ্ট কুরিলকিনের মূর্তিগুলো অস্পষ্টভাবে তার মনে তখনো বিভীষিকা জাগিয়ে রেখেছে। কথা না বলে সে চুপ করে অপেক্ষা করে রইল। ভাবলে ঝিই বলবে কাল রাতের কাণ্ড-কারখানা শেষ পর্যন্ত কতোদর গড়িয়েছিল।

আক্‌সিনিয়া তাকে সকালের পোশাক এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আর কতো ঘুমোবেন আদ্রিয়ান প্রোহোরভিচ্? আমাদের পড়শী ঐ দর্জিটা এসেছিল আপনাকে দেখতে, আর পুলিস কনেস্টবল তাড়াহুড়ো করে বলতে এসেছিল আজ তাদের পুলিস ইন্‌স্পেকটরের রাশি-তিথি জন্মতিথি, কিন্তু আপনি ঘুমোচ্ছিলেন দেখে আর ওঠাইনি।'

'আর ঐ মৃত বিধবা ত্রিউখিনার কাছ থেকে কেউ আসেনি?'

'ত্রিউখিনা? কেন? সে মারা গেছে না কি?'

'তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না! তার সৎকারের তোড়জোড় করার কাজে তুমি আমার সঙ্গে হাত লাগলে না কাল?'

'আপনি কি পাগল হলেন কর্তা? নাকি কাল রাতের নেশার ঝোঁক এখনো আপনার মাথায় আছে? কাল সৎকার হল আবার কোথায়! সারাদিন তো আপনি ওই জার্মানটার ওখানে ভোজ খেয়েছিলেন। তারপর ফিরেছিলেন মাতাল হয়ে। তারপর সেই বিছানা নিয়েছেন আর এই এতক্ষণ বাদে উঠলেন। ওদিকে গীর্জার দুপুরের ঘণ্টা পর্যন্ত থেমে গেছে।'

হাঁপ ছেড়ে কাফনওয়ালা বললে, 'তাই নাকি?'

ঝি বললে, 'তা নাতো আবার কি।'

'তাহলে, জলদি চা বানাও আর আমার মেয়েগুলোকে ডেকে দাও।'

পোস্টমাস্টার





যদিও নামেতে ছিলো সে চৌকিদার
ডাক-স্টেশনেতে প্রতাপ ভীষণ তার।

—প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কি [১১]

এমন কাউকে আমি দেখিনি যে কখনো ডাক-স্টেশনের পোস্টমাস্টারকে অভিশাপ দেয়নি, কিংবা তার সঙ্গে হল্লা বাধায়নি, যে সাংঘাতিক খাতাখানাতে স্বৈরাচারী ও দুর্বিনীত আচরণ এবং বেটাইমী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অর্থহীন নালিশ টুকে রাখার কথা, হঠাৎ ক্ষেপে উঠে সেই খাতাখানা চেয়ে বসেনি; অথবা তাকে মানবরূপী এমন এক দানব বলে গণ্য করেনি যে সেই সেকালের কিছু আমলার মতোই বদ, এবং অন্ততপক্ষে 'মুরম্‌' দস্যুদের চেয়ে একতিলও ভালো নয়। তবু একবার নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করা যাক এবং ওদের জায়গায় দেখা যাক নিজেকে দাঁড় করিয়ে। তাহলে হয়ত বা একটু

ক্ষমার চোখে ওদের দেখা সম্ভব হবে। পোস্টমাস্টার আসলে কী? — ক্ষুদে কর্মচারীদের মধ্যে একজন শহীদ। শুধু তার সরকারী পদমর্যাদাটুকু ছাড়া চড়চাপড় ঘুসি থেকে তাকে বাঁচাবার কিছু নেই এবং তাতেও যে সে বাঁচবে এমন নয় (পাঠকেরা নিজের বিবেকের দিকে তাকান)। প্রিন্স ভিয়াজেমস্কি যাকে রহস্য করে 'ডাক-স্টেশনের ভীষণ প্রতাপশালী প্রভু' বলে অভিহিত করেছেন সেই লোকটির অবস্থা কী কাহিল একবার ভেবে দেখুন। তার কাজ বলতে শুধু এক জঘন্য রকমের মেহনত ছাড়া আর কি? এতটুকু বিশ্রাম তার নেই — না দিনে না রাতে! ঝামেলার যতো পথ ভেঙে আসতে আসতে যাত্রীদের মনের মধ্যে যা কিছু বিরক্তি জমে ওঠে তার সবটুকু তারা এসে উজাড় করে দেয় পোস্টমাস্টারের ওপর। আবহাওয়াটা বিশ্রী, রাস্তা জঘন্য, কোচোয়ানটা একরোখা, ঘোড়াগুলো গেঁতো — এর সব দোষ পোস্টমাস্টারের। তারই হতভাগ্য গুম্‌টি ঘরখানায় যাত্রীরা এসে উঠছে, আর তাকেই গণ্য করছে শত্রু বলে। অনিমন্ত্রিত এই অতিথিদের কবল থেকে সে যদি কখনো তাড়াতাড়ি রেহাই পায়, তবে সে তার ভাগ্য। আর যদি ঘটনাচক্রে সে সময় ঘোড়া মজুত না থেকে থাকে? হায় ভগবান তাহলে সে কি তর্জনগর্জনের পালা! বৃষ্টি হোক কাদা হোক এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি করে বেড়াতে সে বাধ্য। ক্ষিপ্ত যাত্রীর চিৎকার আর ঘাড় ধাক্কা থেকে ক্ষণেকের মুক্তির জন্যে তাকে হয়ত জানুয়ারির তুষার-পাত আর ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাইরের খোলা বারান্দায়। হয়ত এলেন এক জেনারেল, কম্পমান পোস্টমাস্টারকে তার শেষ দুটো ত্রয়কাও ছেড়ে দিতে হল — অথচ ওর একটা ছিল ডাকগাড়ির জন্যে রিজার্ভ করা। মৌখিক একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে জেনারেল চলে

গেলেন। আর তার পাঁচ মিনিট পরেই শোনা গেল ঘণ্টার শব্দ—সরকারী হরকরা এসে টেবিলের ওপর হুকুম-নামা ফেলে দিয়ে তাজা ঘোড়ার চাহিদা জানিয়ে বসল। এইসব ঘটনাগুলো মনে করে দেখুন—তাহলে ক্রোধের বদলে আপনার হৃদয় ভরে উঠবে অকৃত্রিম সহানুভূতিতে। তাছাড়া আরো বলি শুনুন। কুড়ি বছর ধরে আমি রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রায় সব ক'টি ডাক রাস্তা আমার চেনা। সেকাল থেকে একাল প্রায় দু' তিন যুগের কোচোয়ানদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি চিনি না কিংবা সংশ্রবে আসিনি এমন পোস্টমাস্টার নেই বললেই হয়। আমার এইসব সফরের সময় যে সব চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা যথাসত্বর প্রকাশ করার একটা ইচ্ছেও আমার আছে। কিন্তু সে যাই হোক, আপাতত আমার বক্তব্য, পোস্টমাস্টার এই জাতটাকে লোকের কাছে খুব বিকৃতভাবে দেখানো হয়েছে। বহু নিন্দিত এই সব পোস্টমাস্টাররা আসলে বেশ শান্তিপ্রিয় লোক, অমায়িক ব্যবহার, বেশ মিশুক স্বভাবের, নিজেদের প্রাপ্যটুকু বিশেষ বাড়িয়ে হাঁকে না, আর লোভী তো নয়ই। বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক বহু বিষয় তাদের কথাবার্তা থেকে আহরণ করা সম্ভব, অথচ অনেক সম্মানভাজন পরিব্রাজকই এগুলি অবহেলা করে ভুল করেন। আমার কথা যদি বলেন, আমি বরং সরকারী কাজে ভ্রাম্যমান দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের ভাষণ শোনার চাইতে এদের সঙ্গেই কথা বলতে ভালোবাসি, তা মেনে নিচ্ছি।

বুঝতেই পারছেন, পোস্টমাস্টার এই শ্রদ্ধেয় শ্রেণীটির মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছে। বলতে কি, এঁদের একজনের স্মৃতি আমার কাছে আজো অতি মূল্যবান। আমার জীবনে একসময় আমায় তার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। তারই কাহিনীটুকু আমি এবার আমার দরদী পাঠকদের কাছে রাখতে চাই।

১৮১৬ সালের মে মাসে আমাকে 'ক' প্রদেশে সফর করতে হয়েছিল। যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আর এখন অস্তিত্ব নেই। আমি তখন ক্ষুদে এক অফিসারের পদে ঢুকেছি, যেতে হয়েছিল ডাক রাস্তা দিয়েই, কিন্তু দুটি ঘোড়ার বেশী কিছু সংস্থান করা আমার কুলায়নি। ফলে পোস্টমাস্টাররা আমায় বিশেষ সম্ভ্রম দেখাত না। তাই আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য বলে আমার ধারণা, তা আমাকে প্রায়ই আদায় করতে হত জোরজার করে। বয়স তখন কাঁচা, স্বভাবটাও ছিল একটু উগ্র। তাই যখন দেখতাম আমার জন্যে তৈরি রাখা ঘোড়া হঠাৎ কোনো এক বড়ো চাকুরিয়াকে দিয়ে দেওয়া হল তখন এই সব পোস্টমাস্টারের নীচতা ও কাপুরুষতা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলত। গবর্ণরের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসে যদি দেখা যায় যে হতভাগা ভৃত্য পরিবেশনের সময় বিচক্ষণতা বশে আমায় বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছে তবে তা গা-সহা করে নিতে যতটা সময় লাগার কথা, এটাকে গা-সহা করে নিতেও প্রায় ততদিন আমার লেগেছিল। আজকাল ও দুটো ব্যাপারই আমার কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কেননা পদমর্যাদার হিসাবে যারা ছোটো তারা বড়োকে মানবে এই নিয়মের বদলে যদি ধরা যাক মননশক্তির হিসাবে যারা ছোটো তারা তাদের চেয়ে বড়োদের মানবে এই নিয়ম চালু করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে? কী ভয়ানক ঝগড়াই না শুরু হয়ে যাবে! চাকর বাকরেরাই বা কাকে পরিবেশনের সময়ে তোয়াজ করবে প্রথম? কিন্তু সে কথা যাক, কাহিনীতে ফিরে আসি।

সে দিন বেশ গরম পড়েছিল। 'এন' ডাক-স্টেশনটায় পৌঁছতে তখনো তিন ভার্স্ট পথ বাকি, এমন সময় ঝির-ঝিরানি শুরু হল। মিনিট খানেকের

মধ্যেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে ভিজে চবচবে হয়ে গেলাম। ডাক-স্টেশনটায় পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পোশাক বদলে ফেলা এবং দ্বিতীয় কাজ চায়ের হুকুম করা। পোস্টমাস্টার হাঁক দিল, 'এই, দুনিয়া, সামোভারটায় আগুন দে তো, আর গিয়ে খানিকটা ক্রীম জোগাড় করে আন্'। জবাবে পার্টিশান দেয়ালের ওপাশ থেকে বছর চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে তড়বড়িয়ে ছুটে গেল বাইরের বারান্দার দিকে। মেয়েটির রূপ দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কে, তোমার মেয়ে?' আত্মপ্রসাদের সুরে পোস্টমাস্টার বললে, 'হ্যাঁ। ভারি চালাক চতুর, বেশ চটপটে—ঠিক ওর মায়ের মতো।' লোকটা আমার অর্ডার টুকে নিতে শুরু করলে, আর আমি তার অনাড়ম্বর কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানার দেয়ালে-টাঙানো ছবিগুলো দেখতে শুরু করলাম। ছবিগুলোতে 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে একজন শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধকে। মাথায় তার রাতের-টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। তিনি একটি অস্থিরমতি যুবককে বিদায় দিচ্ছেন। যুবকটি তাড়াহুড়ো করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ আর একটি টাকার থলি গ্রহণ করছে। আর একটা ছবিতে খুঁটিনাটি সমেত স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুবকটির স্খলিত চরিত্রের কথা। দেখান হয়েছে সে একটি টেবিলের সামনে বসে আছে আর তার চারিপাশে ঘিরে আছে কপট বন্ধু ও লজ্জাহীনা নারীর দল। এর পরে রয়েছে যুবকটির সর্বনাশ ঘটার ছবি—পরনে তখন তার একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া আলখাল্লা। মাথায় তেকোণা টুপি, শুয়োর চরাচ্ছে আর ওই শুয়োরের খাদ্যই ভাগ করে খাচ্ছে। তার মুখে গভীর বিষণ্ণতা এবং অনুশোচনার ছাপ। শেষ ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে

সে বাপের কাছে ফিরে এসেছে, সহৃদয় বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় এবারেও সেই রাতের-টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। তিনি ছুটে এসেছেন তাকে গ্রহণ করতে। কুপুত্র তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে—পেছনে দেখা যাচ্ছে পাচক একটি চর্বিওয়ালা গোবৎস জবাই করছে আর যুবকটির বড়ো ভাই চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস করছে এইসব ধুমধামের কারণটা কি? প্রত্যেকটি ছবির নিচে জুতসই সব জার্মান শ্লোকও বেশ পাঠ করা গেল। এ সবটাই এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—মনে আছে সেই ফুলভর্তি ভাঁড়টা, ঝকঝকে নক্‌সা-তোলা মশারি সমেত বিছানাটা, আমার চারপাশে যতো কিছু জিনিস ছিল সব। গৃহকর্তাটির মূর্তি এখনো আমার চোখে ভাসছে—স্বাস্থ্যবান, ফূর্তিবাজ, বছর পঞ্চাশেক বয়স, গায়ে একটা লম্বা সবুজ ফ্রক-কোট, ফিকে হয়ে-আসা ফিতেয় লটকানো তিনটি মেডেল তা থেকে ঝুলছে।

আমার আগের কোচোয়ানকে পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কাজ সবে শেষ হয়েছে ইতিমধ্যেই দুনিয়া ফিরে এল তার সামোভার নিয়ে। কিশোরী এই লাস্যময়ীর বুঝতে দেরি হয়নি, আমার মনে সে কিরকম ছাপ ফেলেছে। আমাকে দেখে সে তার নীল চোখদুটো লাস্যভরে নামিয়ে নিলে। আমি তার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলাম—সে একটুও সঙ্কোচ না করে জবাব দিয়ে গেল। সংসারের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা হলে পরে মেয়েরা যেরকমভাবে কথা কইতে পারে তেমনি করে। দুনিয়ার বাপের দিকে আমি এক গ্লাস মদের পাঞ্চ এগিয়ে দিলাম—দুনিয়ার জন্যে এগিয়ে দিলাম এক কাপ চা। তারপর তিনজনে কথা কইতে শুরু করলাম যেন কতো কাল থেকে আমাদের জানাশোনা।



অনেক আগে ঘোড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পোস্টমাস্টার আর তার মেয়েকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। তবু একসময় উঠতে হল। বাপ শুভযাত্রা কামনা করলে, মেয়ে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে এল। বার বারান্দায় এসে আমি একটু দাঁড়ালাম। দুনিয়াকে বললাম, তাকে একটি চুমু খেতে সে দেবে কিনা। দুনিয়া আপত্তি করলে না।

'যেদিন থেকে শুরু হল উপভোগের এই খেলা' সেদিন থেকে অসংখ্য চুম্বনের কথা আমি মনে করতে পারি। কিন্তু তার কোনটাই এমন আনন্দের, এমন চিরকালের স্মৃতিরধন হয়ে থাকেনি।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ঘটনাচক্রে আবার আমাকে সেই একই পথ দিয়ে সেই একই সব জায়গায় যেতে হয়েছিল। পোস্টমাস্টারের মেয়েটির কথা আমার মনে ছিল। তাকে আবার দেখা যাবে এই কল্পনায় মনটা খুশি হয়ে উঠল। পরে মনে হল, হয়ত বুড়ো পোস্টমাস্টারের চাকরি এখন নাও থাকতে পারে, ইতিমধ্যে দুনিয়ার বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ওদের কেউ একজন হয়ত বেঁচেই নেই—একথাটাও আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল আর ডাক-স্টেশনের দিকে যত এগুতে লাগলাম ততই নানা আশঙ্কায় মন হয়ে উঠছিল বিষণ্ণ।

আমার ঘোড়াগুলো পোস্টমাস্টারের ছোটো ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর ঢুকতেই নজরে পড়ল সেই 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা ছবিগুলো। টেবিল আর বিছানাটা সেই পুরনো জায়গাটিতেই আছে। কিন্তু জানলায় এবার আর কোনো ফুল দেখা গেল না। ঘরের সব কিছুতেই কেমন একটা ক্ষয় আর অবহেলার ছাপ। পোস্টমাস্টার একটি ভেড়ার চামড়ার কোট

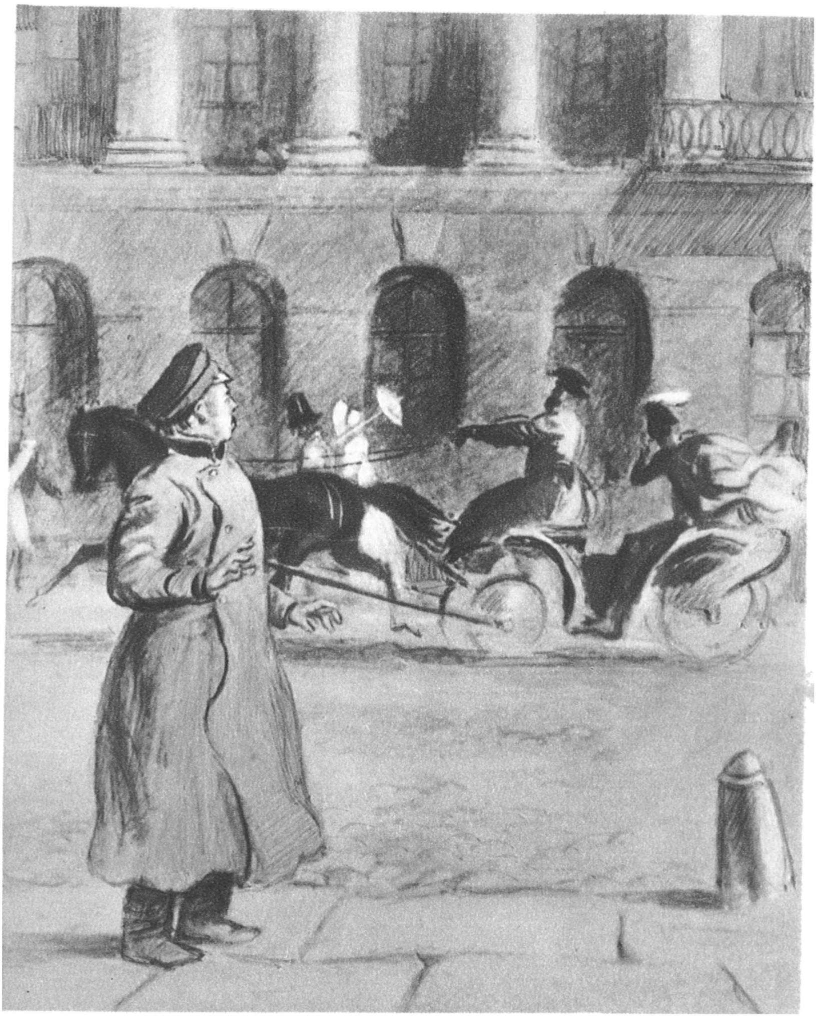
গায়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমি আসতে উঠে বসল··· হ্যাঁ সাম্‌সন ভিরিনই বটে, কিন্তু কি ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে লোকটা। ও যখন আমার অর্ডার নকল করে নিচ্ছিল তখন ওর পাকা চুল, না-কামানো গালের ওপর গভীর ভাঁজ, আর নুয়ে পড়া কাঁধের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম অমন হৃষ্টপুষ্ট একটা মানুষ এই তিন চার বছরেই এমন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে গেল কি করে। 'আমায় চিনতে পারছ না?' আমি বললাম, 'এর আগে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল'। ও বিমর্ষভাবে বললে, 'তা খুবই সম্ভব। এটা খুব ভিড়ের রাস্তা, অনেক যাত্রীই এখানে আসে।' বললাম, 'তা তোমার দুনিয়া কেমন আছে?' বুড়োমানুষটা ভ্রূকুটি করলে, 'ভগবান জানেন'। 'ওর বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে?' বুড়ো লোকটা ভাব দেখালে যেন সে আমার কথা শুনতে পায়নি। আপন মনে আমার অর্ডারখানা পড়েই যেতে লাগল ফিসফিস করে। সুতরাং প্রশ্ন করা বন্ধ রেখে কেটলিটা চাপাতে হুকুম দেয়া গেল। কৌতূহল আমায় খোঁচা মারছিল। ভাবলাম একগ্লাস পাঞ্চ দিয়ে হয়ত আমার পুরনো বন্ধুর মুখ খোলা যাবে।

দেখলাম ঠিকই ভেবেছিলাম। এগিয়ে দেওয়া গ্লাসটাতে বুড়োর আপত্তি হল না। দেখা গেল 'রাম' টানতে টানতে ওর বিমর্ষ ভাবটা কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গ্লাসের শেষে সে কথা কইতে শুরু করলে। আমি কে তা চিনতে পারলে, অন্তত চিনতে পারার ভান করলে। অতঃপর তার কাছ থেকে যে কাহিনীটা শোনা গেল, তা যুগপৎ উৎসুক ও বিচলিত করে তলল বিচিত্র ভাবে।

ও বলতে লাগল, 'তা হলে আপনি আমার দুনিয়াকে চিনতেন? আহা রে, কে তাকে না চিনত! দুনিয়া! দুনিয়ারে! কি মেয়েই না সে ছিল! এখানে যেই এসেছে সেই ওর প্রশংসা করেছে। ওর বিরুদ্ধে একটা কথাও কেউ কখনো বলেনি। ভদ্রমহিলারা ওকে কতো উপহারই না দিয়েছেন, কেউ একটা রুমাল কেউ এক জোড়া দুল। ভদ্রলোকেরা যখন ডাক-স্টেশনটায় আসত তখন তারা ইচ্ছে করে দেরি করত যেন ডিনার বা সাপারের জন্যেই বুঝি দেরি করছে। কিন্তু আসলে তার কারণ ওকে আরো কিছুক্ষণ দেখতে পাবে। যতই রাগ হোক না কেন, ওকে দেখামাত্র রাগ জল হয়ে যেত— আমার সঙ্গে তারা কথা শুরু করত ভদ্রভাবে। বিশ্বাস করবেন না হয়ত— কিন্তু হরকরা আর সরকারী মেসেঞ্জাররা পর্যন্ত তাদের দিনের আধ ঘণ্টার অবসরটুকু কথা কয়ে যেত ওর সঙ্গে। আমার গেরস্তালির সেই ছিল ভরসা। ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্না করা, সব কিছুই সে করে দিত। আর আমি এই বুড়ো বেকুব— ওকে না দেখে আমিও থাকতে পারতাম না, ওকে নিয়ে আমার আনন্দ যেন উপছে পড়ত। দুনিয়াকে ভালোবাসিনি তা তো না, ওকে মাথায় করে রাখতে চাইনি তা তো নয়। ওর জীবনে দুঃখ কষ্ট তো কিছু ছিল না! কিন্তু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে কি আর কেউ সর্বনাশ ঠেকাতে পেরেছে? —কপাল খণ্ডাবে কে!' এই বলে পোস্টমাস্টার সর্বনাশের বিশদ একটা বিবরণ দিতে শুরু করলে।

তিন বছর আগে এক শীতের সন্ধ্যায় পোস্টমাস্টার নতুন একটা লেজার বইয়ের ওপর রুল টানছে আর তার মেয়ে পার্টিশানের পেছনে বসে বসে নিজের জন্যে একটা পোশাক সেলাই করছে। এমন সময় একটি ত্রয়কা এসে থামল।

একজন যাত্রী ঘরে ঢুকল। মাথায় তার একটা চের্কেসীয় টুপি, গায়ে একটা মিলিটারি গ্রেটকোট আর মোটা মাফলার। ঢুকেই সে ঘোড়ার জন্যে তলব করলে। ঘোড়া তখন সব বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা শুনে যাত্রীটি তার গলার পর্দা চড়ালে—উঁচু করলে হাতের চাবুক। ঠিক সেই মুহূর্তে দুনিয়া পার্টিশানের পেছন থেকে ছুটে এসে মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করলে উনি কিছু খাবেন কিনা। এ রকম ঘটনা দেখতে দুনিয়া অভ্যস্ত ছিল। তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সচরাচর যা ঘটে এবারেও তাই ঘটল। যাত্রীটির রাগ পড়ে গেল। ঘোড়া না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজী হয়ে রাতের খাবারের জন্যে হুকুম দিলে। লোকটা তার ভেজা খসখসে ফারের টুপিটা খুললে, মাফলারটা খসালে আর গ্রেটকোটটা ছুঁড়ে ফেললে। দেখা গেল লোকটা আসলে একহারা চেহারার একজন তরুণ ঘোড়সওয়ার অফিসার। মুখে তার ছোটো কালো একটু মোচ। পোস্টমাস্টারের সংসারে সে বেশ স্বচ্ছন্দে খাপ খাইয়ে নিলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্টমাস্টার আর তার মেয়ের সঙ্গে খোশ-গল্প শুরু করে দিলে। রাতের খাবার দেওয়া হল। ইতিমধ্যে ঘোড়াও এসে গিয়েছিল। পোস্টমাস্টার হুকুম দিলে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেবারও দরকার নেই। এখুনি তাদের ঐ যাত্রীটির স্লেজের সঙ্গে যুতে দিতে হবে। ঘরে ফিরে কিন্তু দেখা গেল যুবকটি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে। লোকটার নাকি মূর্ছার মতো লাগছে, মাথা ধরেছে, সফর করার মতো নাকি তার অবস্থা নয়··· তাহলে আর উপায় কী? পোস্টমাস্টার তাঁর বিছানাটি ওর জন্যে ছেড়ে দিলে। ঠিক হল রোগী যদি সকালের মধ্যে ভালো হয়ে না ওঠে তাহলে 'গ' শহর থেকে বৈদ্য ডেকে আনতে হবে।



পরের দিন ঘোড়সওয়ারটির অবস্থা আরো কাহিল হয়ে দাঁড়াল। ওর চাকর গেল ঘোড়া চেপে কাছের শহরটায় বৈদ্য ডেকে আনতে। দুনিয়া একটি রুমাল ভিনিগারে ভিজিয়ে তার কপালে জলপটি দিতে লাগল আর বিছানার পাশে গিয়ে বসল সেলাই নিয়ে। পোস্টমাস্টার সামনে থাকলে রোগী শুধু গোঙাত একটা কথা বলতে পারত না। যদিও কাপ দুয়েক কফি সে খেলে ঠিকই আর গোঙাতে গোঙাতেই হুকুম দিলে ডিনারের। দুনিয়া তার পাশ থেকে কখনো নড়ত না। লোকটার অনবরত তেষ্টা পেত আর দুনিয়া অনবরত তার জন্যে নিজের-হাতে-তৈরি-করা লেমনেড এনে দিত এক এক জগ। রোগী তা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মগ ফেরত দেবার সময় প্রত্যেকবারই দুনিয়ার হাতটা নিজের দুর্বল মুঠিতে ধরে চাপ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা বোঝাত। বৈদ্য এলেন ডিনারের সময়। তিনি রোগীর নাড়ী দেখলেন, রোগীর সঙ্গে কথা কইলেন জার্মান ভাষায়, তারপর রুশ ভাষায় জানালেন যে এখন রোগীর প্রয়োজন শুধু বিশ্রামের। দিন দুয়েকের মধ্যেই সে সফর করার মতো অবস্থায় ফিরে আসবে। ঘোড়সওয়ারটি তাঁকে ভিজিট বাবদ পঁচিশ রুবল শোধ দিয়ে ডিনারে নেমন্তন্ন করলে। বৈদ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন না। তারপর দুজনে মিলে খেল পেট পুরে। এক বোতল মদ নিঃশেষ করলে আর পরস্পর ভারি জমে গেল।

আরো একদিন কাটল। ঘোড়সওয়ারটি পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠল। সেদিন ভারি খুশি দেখা গেল তাকে, অনবরত রহস্য তামাসা করছে, কখনো দুনিয়ার সঙ্গে, কখনো পোস্টমাস্টারের সঙ্গে, শিস্ দিচ্ছে, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গল্প জমাচ্ছে, লেজারে যাত্রীদের রিলে-বার্তা সব নিজেই টুকে রাখছে,

লোকটাকে শেষ পর্যন্ত পোস্টমাস্টারের এতই পছন্দ হয়ে গেল যে তৃতীয় দিন সকালে এই হাসিখুশি অতিথিটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন' তা সহ্য করা কঠিন হয়েছিল তার। দিনটা ছিল রবিবার—দুনিয়া গীর্জায় যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল। ঘোড়সওয়ারটির স্লেজটিকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। তার থাকা-খাওয়ার বাবদ লোকটা পোস্টমাস্টারকে ঢালাও ভাবে বখশিস করে বিদায় নিলে। দুনিয়ার কাছেও সে বিদায় নিলে, তারপর প্রস্তাব করলে যাবার পথে দুনিয়াকে একটু সে গীর্জায় পৌঁছে দিতে চায়, কারণ গীর্জাটা ছিল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। মনে হল দুনিয়া একটু বিব্রত বোধ করছে। কিন্তু বাপ বললে, 'ভয় কি, উনি তো আর নেকড়ে নন। তোমাকে কামড়াবেন না; তা গাড়ী করে উনি যদি তোমায় পৌঁছে দিতে চান তো দিন না।' দুনিয়া স্লেজে উঠে লোকটার ঠিক পাশেই বসল। চাকরটি লাফিয়ে উঠল বক্স-সীটে। কোচোয়ান শিস্ দিলে, ঘোড়া ছুটল কদমে।

বেচারী পোস্টমাস্টার কখনো ভেবে পায়নি কি করে সে তার দুনিয়াকে ও লোকটার সঙ্গে যেতে দিল, কি করে অমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, কি চেপেছিল তার মাথায়। আধ ঘণ্টাও কাটেনি, পোস্টমাস্টারের মনটা অস্থির হয়ে উঠল। এমন একটা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল তাকে যে সে আর থাকতে পারল না, দুনিয়ার খোঁজ করতে গেল গীর্জায়। গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছতে দেখা গেল লোকজন সব বেরিয়ে আসছে কিন্তু গীর্জার দাওয়ায় বা আঙ্গিনায় কোথায়ও দুনিয়ার দেখা পাওয়া গেল না। গীর্জার ভেতরেও সে ঢুকলে হন্তদন্ত হয়ে। পুরোহিত বেদী ছেড়ে চলে গেছে। গার্জার সেক্সটন মোমবাতি-গুলো নিবিয়ে দিতে শুরু করেছে, শুধু এককোণে দুটি বুড়ির তখনও প্রার্থনা

শেষ হয়নি। কিন্তু দুনিয়া নেই কোথাও। অভাগা বাপ শেষ পর্যন্ত সেক্সটনকেই জিজ্ঞেস করলে, দুনিয়া প্রার্থনায় এসেছিল কিনা। সেক্সটন জানালে সে আসেনি। পোস্টমাস্টার যখন বাড়ি ফিরল তখন তাকে জ্যান্ত মানুষ বলে আর চেনা যায় না। তার শেষ আশা তখনো এই—দুনিয়া হয়ত কাঁচাবয়সী চাপল্যের ঝোঁকে পরের ডাক-ঘাঁটি পর্যন্ত উজিয়ে গিয়ে থাকবে, সেখানে তার ধর্ম মা আছেন্। গাড়িখানার সঙ্গে যে ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত তাই পোস্টমাস্টারকে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করতে হল। সারাদিন কেটে গেল, কোচোয়ান ফিরল না। অবশেষে রাতের দিকে সে ফিরল একা এবং একটু মত্ত অবস্থায়। তার কাছ থেকে যে সংবাদ পাওয়া গেল তা মারাত্মক। পরের ডাক-ঘাঁটি থেকে দুনিয়া লোকটার সঙ্গেই কোথায় চলে গিয়েছে।

বুড়ো মানুষটা এই দুর্বিপাক সইতে পারল না। সেই রাতেই সে বিছানা নিলে—সেই বিছানা যাতে ঠিক আগের দিন প্রতারক যুবকটি শুয়েছিল। সব ব্যাপারটা মনে মনে খতিয়ে দেখে পোস্টমাস্টারের এখন মনে হল অসুখের ঘটনাটা ছিল যুবকটির ভান। বেচারী পোস্টমাস্টারের জ্বর বাড়তে লাগল হুহু করে, তাই তাকে 'গ' শহরে নিয়ে যাওয়া হল। অন্য একজন পোস্টমাস্টার তার জায়গায় বহাল হল সাময়িকভাবে। যে বৈদ্যটি সেই ঘোড়সওয়ারটিকে দেখেছিলেন তিনিই পোস্টমাস্টারেরও চিকিৎসা করলেন। তার কাছ থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে লোকটা নাকি বেশ সুস্থই ছিল, তখনই নাকি বৈদ্যটি তার বদ্ মতলব টের পেয়েছিল কিন্তু ঘোড়সওয়ারটির চাবুকের ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি। জার্মানটা সত্যি কথাই

বলুক কিংবা তার সেয়ানা বুদ্ধির বড়াই করেই থাকুক তাতে বেচারা রোগীর কোনো সান্ত্বনাই ছিল না। অসুখ সারা মাত্রই সে 'গ' শহরের কর্তৃপক্ষের কাছে দু'মাসের ছুটির দরখাস্ত করলে এবং কাউকে কিছু না বলে মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল পায়ে হেঁটে। লেজার থেকে সে দেখে নিয়েছিল ক্যাপটেন মিন্‌স্কির গন্তব্য ছিল স্মোলেন্‌স্ক থেকে পিটার্সবুর্গ। যে-কোচোয়ান তাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে বললে দুনিয়া নাকি সারা রাস্তা কেঁদেছে, যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল সে নিজের ইচ্ছেতেই গিয়েছে। 'ভগবান করেন তো আমার হারিয়ে যাওয়া মেষশাবকটিকে আমি ফিরিয়ে আনবই।' এই ভেবে আশায় বুক বেঁধে পোস্টমাস্টার এসে পৌঁছল পিটার্সবুর্গে। সেখানে সে উঠল ইজমাইলভ রেজিমেণ্টে, অবসর-প্রাপ্ত এক ননকমিশন্‌ড্‌ অফিসারের ঘরে। সামরিক সার্ভিসের সময় এ লোকটি ছিল তারই এক সহযোদ্ধা। সেখান থেকে সে তার তল্লাসী শুরু করলে। শীগ্‌গিরই খোঁজ পাওয়া গেল যে ক্যাপ্‌টেন মিন্‌স্কি পিটার্সবুর্গেই আছে—দেমুতভ্‌ পানশালায় নাকি তার আস্তানা। পোস্টমাস্টার ঠিক করলে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

অতি প্রত্যূষে সে মিন্‌স্কির বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। সেপাই চাকরকে অনুরোধ করলে—হুজুরকে যেন সে খবর দিয়ে বলে যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। একটা সওয়ারী-বুট খোঁটায় লাগিয়ে চাকরটা সেটাকে পরিষ্কার করছিল। সে বললে, 'কর্তা ঘুমুচ্ছেন, এগারোটার আগে তিনি কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন না'। পোস্টমাস্টারকে তখন চলে যেতে হল কিন্তু আবার সে ফিরে এল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। গায়ে একটা



ড্রেসিং গাউন, মাথায় একটা লাল ফেজ—মিন্‌স্কি স্বয়ং এসে তার সঙ্গে দেখা করলে। বললে, 'তোমার জন্যে ভাই কী আমি করতে পারি?' বুড়ো লোকটার বুক ভরে উঠেছিল আবেগে, চোখ ছাপিয়ে জল আসছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধু বিড়বিড় করলে, 'হুজুর, ভগবানের দোহাই, হুজুর…' মিন্‌স্কি তার দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে লাল হয়ে উঠল। তারপর তাকে হাতে ধরে নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। বুড়ো লোকটা বলে চলল, 'হুজুর; যা একবার যায় তা আর ফেরার নয় জানি, তবু আমার বেচারী দুনিয়াকে আপনি ফিরিয়ে দিন। তাকে নিয়ে আপনার যা আনন্দ করার তা তো করেছেন—মিছিমিছি তাকে আর নষ্ট করবেন না।' যুবাপুরুষটি সত্যিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'যা ঘটেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। তোমার প্রতি আমি অবিচার করেছি আমায় ক্ষমা কোরো। তবে একথা ভেবো না যে দুনিয়াকে ফেলে পালাব—একাজ আমার দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না। ও সুখী হবে —আমি তোমাকে দিব্যি করে বলছি । তাকে নিয়ে তুমি কি করবে? আমায় সে ভালোবাসে। তার আগের জীবনের সঙ্গে সে আর খাপ খাবে না। যা ঘটে গেছে তা ভুলতে তুমিও পারবে না, সেও পারবে না।' তারপর পোস্টমাস্টারের আস্তিনের মধ্যে কি একটা গুঁজে দিয়ে সে দরজা খুলে দিলে। পোস্টমাস্টার ঠাহরও করতে পারলে না, কখন সে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বহুক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় তার খেয়াল হল আস্তিনের মধ্যে কি এক গোছা কাগজ রয়েছে। জিনিসটা বার করতে দেখা

গেল পঞ্চাশ-রুবলের কয়েকটা দলামোচড়া নোট। চোখ ছাপিয়ে আবার তার কান্না এল—ঘৃণার কান্না। নোটগুলো একটা দলা পাকিয়ে সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তারপর জুতোর গোড়ালি দিয়ে তাদের মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে গেল। কয়েক গজ যাবার পর দাঁড়িয়ে পড়ে আবার কি ভাবলে, তারপর··· ফিরে এল। কিন্তু নোটগুলো তখন আর সেখানে নেই। বেশ সাজগোজ করা একটি যুবক ওকে দেখে ছুটে গেল একটা দ্রজকির দিকে এবং তাড়াহুড়ো করে হুকুম দিলে—'চালাও!' তাকে অনুসরণ করার কোনো চেষ্টাই পোস্টমাস্টার আর করলে না। সে ঠিক করল ডাক স্টেশনেই ফিরে যাবে। কিন্তু তার আগে মাত্র একবারের জন্যে হলেও দুনিয়াকে একবার দেখে যেতে হবে। তাই দিন-দুই পরে সে আবার গেল মিন্‌স্কির কোয়ার্টারে। কিন্তু সেপাই চাকরটা কড়া গলায় জানিয়ে দিলে তার মনিব কারো সঙ্গেই দেখা করবে না। তারপর ঘাড়ে ধরে তাকে হলের বাইরে ঠেলে দিয়ে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পোস্টমাস্টারকে বাড়িতে ফিরে যেতে হল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে শহীদ-গীর্জায় সার্ভিস সেরে লিতেইনাইয়া স্ট্রিট ধরে ফিরছিল। এমন সময় একটা দামী গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। পোস্টমাস্টারের নজরে পড়ল তাতে মিন্‌স্কি বসে আছে। গাড়িটা তিনতলা একটা বাড়ির সামনে দরজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল আর মিন্‌স্কি লাফ দিয়ে নামল বাড়িটার বার-বারান্দায়। একটা আশা ঝলক দিয়ে গেল পোস্টমাস্টারের মনে। গাড়িখানা পর্যন্ত উজিয়ে এসে সে কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে, 'কার গাড়ি ভাই এটা? মিন্‌স্কির নয়কি?' কোচোয়ান বললে, 'তারই

বটে, কেন?' 'ব্যাপার হয়েছে কি, তোমার মনিব আমায় বলেছিল তার দুনিয়ার কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে। কিন্তু এই দুনিয়া যেখানে থাকে, সেখানকার ঠিকানাটা ভুল হয়ে গেছে।' 'সে কি? সে তো এখানেই থাকে ঐ দোতলায়। কিন্তু চিঠি পৌঁছাতে ভাই তোমার যে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। মিন্স্কি নিজেই এসে হাজির হয়ে গিয়েছে যে।' পোস্টমাস্টারের বুকের মধ্যে বিচিত্র একটা টিপটিপনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'তাতে কিছু এসে যাবে না। আমাকে পাত্তা মিলিয়ে দিলে সে জন্যে ধন্যবাদ। কথা যা দিয়েছিলাম, তা রাখতেই হবে আমাকে'—এই বলে সে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলে।

দরজা বন্ধ ছিল। ঘণ্টা দিয়ে সে ডাকলে। কি-হবে কি-হবে ভেবে কয়েক সেকেণ্ড তার কাটল অসীম যন্ত্রণায়। অবশেষে দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া গেল, দরজা খুলল। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আভদোতিয়া সামসোনোভনা এখানে থাকেন কি?' অল্প বয়সী ঝিটি উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, থাকেন, কি দরকার?' কোনো কথার জবাব না দিয়ে পোস্টমাস্টার ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে হলের ভেতরে। ঝি পেছন থেকে হাঁক দিলে, 'না, না, ভেতরে যাওয়া চলবে না এখন। আভদোতিয়া সামসোনোভনা এখন অন্যের সঙ্গে ব্যস্ত।' কিন্তু পোস্টমাস্টার কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়েই গেল। প্রথম যে দুটি ঘর পড়ল তা অন্ধকার। কিন্তু তৃতীয় ঘরখানায় আলো জ্বলছে। খোলা দরজাটা দিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অতি সুসজ্জিত ঘরখানার ভেতরে মিন্স্কি গভীর কি একটা চিন্তায় মগ্ন। দুনিয়া তার চেয়ারের হাতলে বসে আছে, ঠিক ইংরেজী কায়দায় ট্যারচাভাবে ঘোড়ায় চাপার ভঙ্গিতে। সাজসজ্জায় তার ফ্যাশনের বেশ ঘটা।

মিন্স্কির দিকে সে চেয়ে আছে দরদভরা দৃষ্টিতে আর তার কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ নিয়ে আঙুলে জড়াচ্ছে। আঙুলে ঝিকঝিক করছে মণি-মুক্তার আংটি। বেচারী পোস্টমাস্টার! তার মেয়েকে এত রূপসী সে আর কখনো দেখেনি। মুগ্ধের মতো সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। 'কে ওখানে?' দুনিয়া তার মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলে। পোস্টমাস্টার চুপ করে রইল। জবাব না পেয়ে দুনিয়া মুখ তুলে তাকালে··· আর তারপর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। ভয় পেয়ে মিন্স্কি দুনিয়াকে ধরে তোলার জন্যে যেতে গিয়ে দেখল দরজায় বুড়ো পোস্টমাস্টার দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়াকে ফেলে রেখে সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল তার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাও তুমি? চোরের মতো কেন আমার পিছু নিয়েছ? তুমি আমাকে খুন করতে চাও? বেরোও এক্ষুনি!' তারপর সজোরে বুড়োর কোটের কলার ধরে টানতে টানতে সে তাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে এল।

বুড়ো মানুষটা তার ডেরায় ফিরে এল। বন্ধুটি পরামর্শ দিলে নালিশ করতে। পোস্টমাস্টার কি ভাবল খানিক তারপর হাত নেড়ে সে পরামর্শ বাতিল করে দিল। সে ঠিক করলে কিছুই সে করবে না। দুদিন পরে পিটার্সবুর্গ ছেড়ে সে ফিরে এল তার ডাক-স্টেশনে। এসে বসল তার সেই পুরনো কাজেই। গল্প শেষ করে পোস্টমাস্টার বললে, 'সেদিন থেকে আজ প্রায় তিন বছর—দুনিয়া আমার কাছ-ছাড়া। তার কোনো খবরও পাইনি। ভগবান জানেন মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি নেই। কি না ঘটতে পারে। উটকো এক চালিয়াৎ এসে মেয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল এমন ঘটনা তার



বেলাতেই এই প্রথম ঘটল তা তো নয়, এই শেষ তাও নয়। প্রথমে তাকে রাখবে পরে ফেলে দেবে। পিটার্সবুর্গে এরকমের কাঁচা বয়সের বেকুফ মেয়ের সংখ্যা কতো! আজ তারা সাটিন আর ভেলভেটে সাজগোজ করছে। কাল দেখবেন চৌমাথার মোড়ে ঝাড়ু দিচ্ছে ছেঁড়া ন্যাতাকানি নিয়ে। যখন মাঝে মাঝে মনে হয় কে জানে আমার দুনিয়াও হয়ত ঐ অবস্থায় গিয়ে পড়েছে, তখন না ভেবে পারি না—সে মরুক।

আমার বন্ধু বুড়ো পোস্টমাস্টারের এই হল কাহিনী—সে কাহিনী বলতে গিয়ে বারবার তাকে থামতে হয়েছে চোখের জলে। দ্‌মিত্রিয়েভ-এর সেই চমৎকার ব্যালাডের জেদী তেরেন্তিচ্‌-এর মতো [১২] সে-চোখের জল সে কোটের পাড় দিয়ে বারবার যেভাবে মুছে নিচ্ছিল তা দেখবার মতো। এই চোখের জলের আংশিক একটা কারণ অবশ্যই আমার দেওয়া সেই পাঞ্চ—কাহিনী বলতে বলতে সে পাঁচ গ্লাস টেনেছিল। কিন্তু তবু কাহিনীটা আমাকে প্রবলভাবে অভিভূত করে। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর অনেকদিন পর্যন্ত আমার মাথা থেকে বুড়ো পোস্টমাস্টারের জন্যে ভাবনা দূর হয়নি। হতভাগিনী দুনিয়ার কথা না ভেবে পারিনি।

অল্প কিছুদিন আগে ‘ক’ শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই পুরনো বন্ধুর কথা আবার মনে হয়েছিল। খবর পেলাম যে-ডাক-স্টেশনটায় সে একচ্ছত্র ছিল সেটা আর নেই। ‘বুড়ো পোস্টমাস্টার কি এখনো বেঁচে আছে?’ প্রশ্ন করায় কেউ সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারলে না। ইচ্ছে হল একবার আগের সেই সব পরিচিত জায়গাগুলো দেখে আসা যাক। ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ‘এন্‌’ গাঁয়ের দিকে গাড়ি হাঁকালাম।

তখন শরৎকাল। আকাশ ছেয়ে আছে ধূসর রঙের মেঘে—ফসল কাটা খেত থেকে হিমেল বাতাস বইছে। গাছ থেকে খসে-পড়া যতো লাল আর হলুদ পাতা উড়িয়ে আনছে সঙ্গে করে। সূর্য ডোবার ঠিক আগেই গাঁ-খানায় এসে পৌঁছলাম এবং ডাক-ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। মোটামতো একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল বার-বারান্দায়। (একদিন এখানেই আমায় দুনিয়া চুমু খেয়েছিল।) আমার প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি জানাল যে বুড়ো পোস্টমাস্টার বছরখানেক আগে মারা গেছে। তার বাড়িখানার মালিকানা এখন একজন শুঁড়ির, মেয়েটি আসলে সেই শুঁড়িরই বৌ। আমার এতখানি আসা আর তার জন্যে সাত রুবল খরচাই সার হল দেখে আফশোস হচ্ছিল। শুঁড়ি-বৌকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিসে মারা গেল সে? কি হয়েছিল?’ মেয়েটা বললে, ‘মদ খেয়ে খেয়েই গেলেন’। ‘কোথায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে?’ ‘গাঁয়ের ঠিক শেষে—ওর বউয়ের কবরের পাশে।’ ‘আমায় কেউ সেখানে নিয়ে যেতে পারে?’ ‘তা কেন পারবে না। নিশ্চয়ই পারবে। এই ভান্‌কা! বেড়ালটাকে ছেড়ে দে এখন। এই ভদ্দরলোকটিকে একটু কবরখানায় নিয়ে যা। গিয়ে পোস্টমাস্টারের কবরটা দেখিয়ে দিবি।’

ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা, লালচুল, এক-চোখ কাণা একটা ছেলে ছুটে এল। সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে।

যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি পোস্টমাস্টারকে চিনতে?’

‘হ্যাঁ, খুব চিনতাম। ওই তো আমায় হুইসিল তৈরি করা শিখিয়েছিল। যখন সে পানশালা থেকে বেরুত—ভগবান তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন—আমরা তার পেছনে ছুটতে ছুটতে বলতাম, “ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা, বাদাম দেবে

না আমাদের?" অমনি সে আমাদের সকলকে বাদাম দিত। আমাদের সঙ্গে সব সময় সে খেলা করত।'

'যাত্রীরা তার খোঁজ খবর করে এখনো?'

'আজকাল তো আর যাত্রী বিশেষ আসে না। গাঁয়ের হাকিম-টাকিম মাঝে মধ্যে আসে, কিন্তু মরা লোকেদের সম্পর্কে সে কিছু ভাবে না। তবে এই বছর গরমকালে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি পুরনো পোস্টমাস্টারের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন আর তার কবর দেখতেও এসেছিলেন।'

কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম মহিলা?'

ছেলেটা বললে, 'ভারি সুন্দর দেখতে। ছয়-ঘোড়া এক গাড়িতে করে উনি এসেছিলেন। সঙ্গে তিনটে ছেলে নিয়ে, একটা ধাই, আর একটা কালো বাঁটকুল কুকুর। লোকে যখন বললে পুরনো পোস্টমাস্টার মরে গেছে, তখন উনি খুব কাঁদলেন। ছেলেগুলোকে বললেন, "তোমরা চুপ করে এখানে থাকো, আমি একটু কবরখানা থেকে ঘুরে আসি।" আমি বলেছিলাম আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু উনি বললেন, "পথ আমি চিনি"। ভারি দয়ালু ছিলেন উনি—আমাকে পাঁচ কোপেকের সিক্কা দিয়েছিলেন একটা।'

কবরখানায় পৌঁছানো গেল। খোলা একটা জায়গা—কোথাও এতটুকু বেড়া নেই। এখানে ওখানে কাঠের ক্রস—তাদের ওপর রোদ্দুর আটকাবারও কোনো গাছ নেই। এমন বিষণ্ণ একটা কবরখানা আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

ছেলেটা একটা বালির ঢিপির ওপর লাফিয়ে উঠে বললে, 'এই হল বুড়ো পোস্টমাস্টারের কবর'।

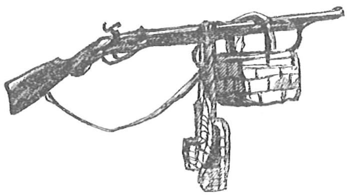
টিবিটার ওপর পেতলের মূর্তি-লটকানো কালো একটি ক্রস পুঁতে রাখা হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘মহিলাটি এইখানেই এসেছিলেন তাহলে?’ ভানিয়া বললে, ‘হ্যাঁ এসেছিলেন। আমি দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এইখানে উনি পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন। তারপর উনি, ঐ মহিলাটি, গাঁয়ে ফিরে এলেন। পুরোহিতকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে কতকগুলো টাকা দিলেন আর আমাকে দিলেন পাঁচ কোপেক দামের রূপোর একটা সিক্‌কা—ভারি চমৎকার মহিলা।’

আমিও ছোঁড়াটাকে একটা পাঁচ-কোপেকী সিক্‌কা দিলাম। এখানে আসা বা তার জন্যে যে সাত-রুবল খরচা হল—তাতে আমার আর কোনো আফশোস ছিল না।

ਪ੍ਰੇਤ
ਕਹਾਣ

8—1450





যে সাজে সাজো, হে প্রিয়তমা, তবু যে কাড়ো মন।

—বোগদানোভিচ্ [১৩]

ইভান পেত্রোভিচ বেরেস্তভের জমিদারিটা ছিল আমাদের দেশের সুদূরগম্য একটি প্রদেশে। যৌবনে ইভান পেত্রোভিচ কাজ নিয়েছিলেন রাজকীয় রক্ষী বাহিনীতে। তারপর ১৭৯৭ সালের প্রথম দিকে কাজ থেকে ছাড় নিয়ে তাঁর জমিদারিতে গিয়ে সেই যে বাস শুরু করেন আর নড়েননি। বিয়ে করেছিলেন একটি ভদ্রঘরের গরিব মেয়েকে। মেয়েটি প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। বেরেস্তভ সে সময় উপস্থিতও থাকতে পারেননি—শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের সান্ত্বনা খুঁজতে বেরেস্তভ অতঃপর তাঁর

সম্পত্তি দেখা শোনার কাজে ডুবে যান। বাড়িখানি তৈরি করলেন নিজের বানানো এক প্ল্যান মাফিক, জমিদারির মধ্যে একটি সূতাকল বসালেন, আয় তিনগুণ বাড়িয়ে তুললেন এবং সারা জেলার মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে নিজেকে গণ্য করতে শুরু করলেন। তাঁর এ ধারণায় বাদ সাধার ইচ্ছে প্রতিবেশীদের কারু হয়নি, —পরিবার পরিজন আর শিকারী কুকুর সমভিব্যাহারে তারা বেরেস্তভের বাড়ি এসে বেশ কিছুদিন করে কাটিয়ে যাবার অভ্যেস রপ্ত করে নিয়েছিল। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয়দিন বেরেস্তভের গায়ে থাকত একটা ভেলভেটিনের জ্যাকেট, ছুটির দিনগুলোতে তিনি পরতেন ঘরে-বোনা কাপড়ের ফ্রককোট। হিসেব পত্তর সব নিজেই রাখতেন এবং সিনেটের কার্যবিবরণী ছাড়া আর কিছুই পাঠ করতেন না। মোটের ওপর লোকে তাঁকে অহংকারী বলে মনে করলেও বেশ পছন্দই করত। তাঁর সঙ্গে বনত না এমন লোক ছিল শুধু একজন—তাঁরই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, গ্রিগরি ইভানোভিচ্ মুরম্স্কি। তিনি ছিলেন আবার একেবারে সাবেকী চালের এক রুশ ভদ্রলোক। সম্পত্তির বেশির ভাগটা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন মস্কোতে। তারপর বিপত্নীক হয়ে বসবাস করতে আসেন যে গ্রামটিতে, সেইটিই ছিল তাঁর সম্পত্তির একমাত্র অবশেষ। এখানেও তিনি তাঁর সম্পদ খোয়াতে থাকেন, যদিও একটু অন্যভাবে। বিলেতী কায়দায় তিনি একটি বাগান বসালেন এবং টাকাপয়সা যা ছিল তার প্রায় সবটাই তিনি ঢাললেন এর পেছনে। তাঁর ঘোড়ার সহিস-গুলোকে সাজ করতে হত বিলাতী জকিদের মতো করে। নিজের মেয়ের জন্যে বহাল ছিল ইংরেজ গৃহ-শিক্ষিকা। তাঁর জমিতে চাষও চালানো হত বিলেতী পদ্ধতি অনুসারে।

কিন্তু, 'যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে' ফলে ব্যয়ের পরিমাণ কম ঘটলেও গ্রিগরি ইভানোভিচের আয় কিন্তু বাড়ল না। এই মফস্বলের এলাকাতেও নতুন নতুন দেনা করে বসার মতো উপলক্ষ্য আবিষ্কার করতে তাঁর দেরি হয়নি। তবু সব মিলিয়ে তাঁকে বেশ একজন পাকা লোক গণ্য করা হত—এমন একজন জমিদার যার মাথা থেকে তাঁর প্রদেশে সর্বপ্রথম সর্ব্বোচ্চ জমিদারি-দপ্তরে সম্পত্তি বন্ধক রাখার মতলব বেরিয়েছে। এ রকম মামলা সে যুগে বেশ জটিল এবং দুঃসাহসী বলে মনে করা হত। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া সমালোচক ছিলেন বেরেস্তভ—নতুন কিছু একটা করা সম্পর্কে তাঁর ছিল ঘোর অপছন্দ। তাঁর এই প্রতিবেশীটির বিলিতিয়ানার কথা উঠলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, খুঁত ধরায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। নিজের সম্পত্তি দেখিয়ে আনার সময় কেউ যখন তাঁর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা শুরু করত, তখন ধূর্তের মতো বিদ্রূপ করে তিনি বলতেন, 'তবে, হ্যাঁ। আমাদের প্রতিবেশী গ্রিগরি ইভানোভিচ্ যেভাবে চালান, আমার এখানে সেভাবে আমরা চালাই না। বিলাতী কায়দার বালাই নিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনাটা ঠিক আমাদের পোষাবে না। আমাদের রুশিয়ার যা চল্ তাতেই যদি ভরপেট খাওয়া জোটে তো সেই আমাদের ভালো।' প্রতিবেশীদের উৎসাহের জন্যে ধন্যবাদ। এই সব কথা লেশমাত্র ক্ষয় না পেয়ে গ্রিগরি ইভানোভিচের কানে উঠতে যে দেরি হয়নি, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সাংবাদিকদের মতোই সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা এই বিলেত-পাগল ভদ্রলোকটির বিশেষ ছিল না। ক্ষেপে গিয়ে তিনি আমাদের এই গ্রাম্য 'জয়লাস্'এর নাম দিয়েছিলেন পাড়াগেঁয়ে, ভালুক।

দুই মাতব্বরের মধ্যে যখন এইরকম একটা সম্পর্ক চলছে তখন বেরেস্তভের ছেলে এল বাড়িতে। 'ক' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর তার ইচ্ছে ছিল পল্টনে ঢোকে, কিন্তু বাপের মত মিলল না। উল্টোদিকে, পুত্রের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সরকারী চাকরি করার পক্ষে সে একেবারেই অযোগ্য। দুজনের কেউই নিজের মত ছাড়তে রাজী হল না, এবং ইতিমধ্যে তরুণ আলেক্সেই বিশিষ্ট এক ভদ্রজনের মতো জীবন-যাপন করতে শুরু করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে গোঁপের চর্চা চালিয়ে যেতে লাগল যাতে হঠাৎ পল্টনে যেতে হলে অসুবিধায় না পড়তে হয়।

আলেক্সেই ছিল সত্যিই চমৎকার একটি তরুণ। তার সুঠাম দেহখানা যদি সামরিক ইউনিফর্মে সত্যিই শোভিত হতে না পারে, যদি একটা বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার হিসেবে নাম কেনার বদলে সরকারি নথি-পত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়েই তার যৌবন খরচ করতে হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। শিকার করার সময় সে যখন প্রত্যেকবারই পথের কোনো বাধা না মেনে জোর কদমে সামনে এগিয়ে যেত, তখন পাড়াপড়শীরা একবাক্যে স্বীকার করত যে সরকারি চাকরিতে উন্নতি করা ওর কর্ম নয়। আশেপাশের যুবতী ললনাদের কাছ থেকে যে দৃষ্টিপাত তার ওপর বর্ষিত হত সেটা ঔৎসুক্য থেকে প্রায়ই গিয়ে পেঁ ৗছত একেবারে আকর্ষণে; আলেক্সেই কিন্তু এসব বিশেষ নজরই করত না। তার এই নিরুত্তাপ আচরণের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রেমের ব্যাপার আছে—এই রকম ধরে নেওয়া হয়েছিল। তারই প্রমাণ স্বরূপ একটুকরো কাগজও একসময় হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করেছিল। তাতে তার একটা চিঠি থেকে এই ঠিকানাটা টুকে রাখা ছিল: 'আকুলিনা

কুরোচ্‌কিনা, মস্কো। সেণ্ট আলেক্সেই-এর মঠের সামনে কাঁসারি সাভেলিয়েভের বাড়ি। আ. ন. ব. কাছে এই চিঠিটি পেঁাছে দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

আমার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা কখনো গ্রামাঞ্চলে থাকেননি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না, পল্লীবালাদের মধ্যে কি মাধুর্য লুকোনো। জীবন তাদের গড়ে ওঠে তাজা হাওয়ার মধ্যে, ঘরোয়া আপেল বাগানের ছায়ায়। সমাজ-সংসার সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান তা কেবল বই পড়ে শেখা। নিরালা জীবন, স্বাধীনতার অবকাশ আর পাঠাভ্যাসের ফলে তাদের মধ্যে অল্প বয়সেই এমন সব ভাবালুতা আর হৃদয়াবেগের দেখা মেলে যা আমাদের শহরের স্তুতিধন্যা বিলাসিনীদের অজানা। আমাদের এই গ্রাম-কন্যাদের কাছে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়াই একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, পাশের শহরে বেড়িয়ে আসতে পারলে তো সেটা সারা জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনাই হয়ে থাকবে, আর বাড়িতে যারা বেড়াতে এসে কিছু কাল কাটিয়ে যায় তাদের কথা মনে করে রাখা হবে বহুদিন, কখনো কখনো চিরকাল। কিছু কিছু অসাধারণত্ব যা এদের মধ্যে দেখা যায় তা দেখে কেউ অবশ্য ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু ওপর ওপর দেখে যতই টিটকারি দিন, তাতে এদের আসল গুণ কিছু নাকচ হয়ে যাবার নয়। তার মধ্যে প্রধান একটা গুণই হল এদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য— সেই রকমের একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যা নইলে, জাঁ পল্‌ রিশ্‌তে-র মতে মানুষ বড়ো হতে পারে না। হতে পারে যে বড়ো-বড়ো শহরে মেয়েরা যা শিক্ষা পায় তা উঁচু দরের। কিন্তু অভিজাত সমাজের ধরণ-ধারণের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই চরিত্রের ওপর এমন একটা ছাঁচ-ঢালা প্রভাব এসে পড়তে শুরু করে

যে অনতিবিলম্বে সব মেয়েরই মন ঠিক তাদের মাথার ওড়নার মতোই হুবহু একরকম হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা বলে আমি রায়ও দিচ্ছি না, নিন্দাও করতে চাইছি না, তবু, অতীতের এক লেখক যা বলেছেন সেইভাবেই বলতে হবে, nota nostra manet *।

যাই হোক, গাঁয়ের এইসব তরুণীদের মনে আলেক্সেই যে কী ভীষণ ছাপ ফেলল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রথম তারা এমন একজনকে দেখল যে বিষণ্ন এবং মোহমুক্ত। এই প্রথম তারা কারো কাছ থেকে বিগত আনন্দ আর ব্যর্থ যৌবনের কথা শুনতে পেল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা—আলেক্সেইয়ের হাতে যে আংটি আছে তার রংটা নাকি কালো আর তাতে কংকালের মুণ্ডু খোদাই করা। গ্রামাঞ্চলের পক্ষে এ সবই ভারি নতুন। আলেক্সেইকে নিয়ে সবকটি মেয়েই একেবারে মত্ত হয়ে উঠল।

তবে আলেক্সেই সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি করে যে মাথা ঘামিয়েছিল, সে আর কেউ না, ঐ বিলেত-পাগলের মেয়ে লিজা, অর্থাৎ বেট্‌সি (বাপ তাকে এই নামেই সাধারণত ডাকে)। কর্তাদের মধ্যে পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত ছিল না। তাই পাড়ার সব কটি তরুণীর মুখে যখন আলেক্সেই ছাড়া কথা নেই, তখনো লিজা তাকে দেখেইনি। লিজার বয়স তখন সতেরো। জলপাইয়ের মতো মুখের রং। মুখখানায় ভারি একটা আকর্ষণ, তার মধ্যে কালো একজোড়া চোখ। একমাত্র সন্তান বলে সে স্বভাবতই একটু আদুরে এবং একটু দুষ্টু। ছটফটানি আর দুষ্টুমির তার বিরাম ছিল না, এবং তাতে

---

* যা বলেছি, বলেছি।

বাপ খুশি হলেও একজন কিন্তু বড়োই হতাশ হয়ে পড়তেন। তিনি হলেন গৃহশিক্ষিকা মিস্ জ্যাকসন—বয়স তাঁর চল্লিশ, আইবুড়ি, এনামেল-করা গাল, রং-করা ভুরু, প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর আদ্যন্ত 'পামেলা' বইটি পড়িয়ে শেষ করতেন। এ সবের জন্যে বছরে পেতেন দুই হাজার রুবল্, এবং সব মিলিয়ে এই 'বর্বর রুশ দেশের' একঘেয়েমিতে মরে থাকতেন বললেই হয়।

লিজার পরিচর্যার ভার ছিল তার দাসী নাস্তিয়ার ওপর, বয়সে সে তার তরুণী প্রভুকন্যার চেয়ে কিছু বড়ো, কিন্তু স্বভাবে সমান চঞ্চল। লিজার সঙ্গে তার ভাবও খুব, নিজের সবকিছু গোপন খবর লিজা তাকে জানাত, দুষ্টুমির চক্রান্তে তার কাছ থেকেও সাহায্য নিত। মোট কথা, প্রিলুচিনো গ্রামের পক্ষে নাস্তিয়ার যা গুরুত্ব তা বিয়োগান্তক ফরাসী উপন্যাসের 'মরমী সখি'-চরিত্রগুলির অনেকের চেয়েই ঢের বেশী।

সেই নাস্তিয়া একদিন সকালে তার দিদিমনির সাজগোজ ঠিক করে দিয়ে বললে, 'আজ একটু বেড়াতে যাবো দিদিমনি'।

'যা না, কিন্তু কোথায়?'

'বেরেস্তভ্-বাড়িতে তুগিলভোর কাছে। আজ ওদের রাঁধুনি বউয়ের জন্মতিথি। গতকাল রাঁধুনি বউ এসে আমাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে গেছে।'

'যাবি বৈকি! মনিবে মনিবে ঝগড়া, কিন্তু চাকর বাকরদের মধ্যে যে বড়ো নেমন্তন্নের চল!'

নাস্তিয়াও সমানে জবাব দিল, 'মনিবদের ঝগড়া তো আমাদের কি? তাছাড়া আমি তোমার চাকরানি, তোমার বাবার তো নই। তোমার সঙ্গে

তো এখনো বেরেস্তভ-পুতের ঝগড়া বাধেনি। কর্তাদের লড়াই কর্তারা নিজেরা লড়ে শেষ করুন। আমরা কেন?'

'শোন্ নাস্তিয়া, দেখিস তো, আলেক্সেই বেরেস্তভ্‌কে দেখতে পাস কিনা। ফিরে এসে বলতে হবে কিন্তু কেমন দেখতে, কি রকম লোক।'

নাস্তিয়া সায় দিয়ে চলে গেল। আর সারাদিন অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে রইল লিজা কখন সে ফেরে। নাস্তিয়া ফিরল একেবারে সন্ধ্যের সময়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বললে, 'বেরেস্তভ-পুতকে দেখে এলাম গো লিজাভেতা গ্রিগরিয়েভনা, ভালো মতো নজর করে দেখেছি। সারাদিন তো ওর সঙ্গেই ছিলাম।'

'তাই নাকি? কি দেখলি বল্, বল্ শীগগির আগাগোড়া সব।'

'বলছি দাঁড়াও। আমরা সবাইতো ওখানে গেলাম—আমি, আনিসিয়া ইয়েগোরোভনা, নেনিলা, দুনিয়া…

'ওসব কথা ছাড় বাপু, তারপর কি হল বল্।'

'একেবারে প্রথম থেকে বলি শোনো। তা আমরা তো গিয়ে পোঁছলাম ঠিক সেই ডিনারের সময়। ঘর ভর্তি লোক। কলবিন আর জাহারিয়েভদের বাড়ির চাকররাও এসেছে, গোমস্তার বৌ মেয়েরাও এসেছে, খ্লপিন বাড়ির চাকরেরাও…'

'বেরেস্তভের কি দেখলি বল্।'

'এইতো বলছি, দাঁড়াও খানিক। তারপরে তো আমরা টেবিলে খেতে বসলাম। গোমস্তার বউ বসল গিন্নীর পাশে, আমি বসলাম গোমস্তা বউয়ের

পাশে। গোমস্তার মেয়েগুলো ঠোঁট বাঁকাচ্ছিল কিন্তু আমি তার থোড়াই পরোয়া করি…'

'আ মোলো যা, নাস্তিয়া, তোর এই সাত সতেরো ফিরিস্তি রাখ্‌তো বাপু।'

'অত অধৈর্য কেন গো। তা টেবিল ছেড়ে আমরা তো উঠলাম… ডিনারের খাওয়া চলেছিল তিনঘণ্টা ধরে… বেশ ভালো খাইয়েছে… নীল লাল ডোরাকাটা ব্লাঁ মঁজে টার্ট (পিঠে বিশেষ)—ও ছিল পদের মধ্যে… তা আমরা তো উঠে বাগানের মধ্যে গেলাম চোর-চোর খেলতে। সেইখানে দাদাবাবু এসে হাজির।'

'তাই বুঝি? দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর নাকি রে?'

'ভারি সুন্দর দেখতে, সত্যিকারের সুপুরুষ। একহারা, লম্বা, লালচে গাল…'

'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই ফ্যাকাশে মতো হবে। তারপর দেখে মনে হল কি রকম?—মনমরা গোছের? সব সময় কিছু একটা ভাবে?'

'একেবারে না। এমন উদোম লোক আমি সারা জীবনে দেখিনি বাপু। খেয়াল হল আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে।'

'ও খেলবে তোদের সঙ্গে লুকোচুরি। কি বলছিস যাতা!'

'কিন্তু সত্যিই খেলল যে গো! আর শুধুই কি তাই—মাগো ওর কাছে কেউ ধরা পড়লেই হল, অমনি তাকে ধরে একটা করে চুমু না দিয়ে ছাড়েনি।'

'যাঃ, বানিয়ে বানিয়ে বলছিস্!'

'না গো না—ওর কবল ছাড়িয়ে আমি পালাতে পারলে তো! সারা দিনের মধ্যে ও একবারও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি।'

'কিন্তু সকলেই যে বলে ও প্রেমে পড়েছে, অন্য কারো দিকে চোখ তুলে তাকায় না।'

'তা কি জানি বাপু, আমার পানে তো নিশ্চয়ই তাকিয়েছিল, আর ঐ গোমস্তার মেয়ে তানিয়ার পানে। কল্‌বিনদের পাশাকেও তো বাদ দেয়নি—বুঝে দেখো বাপু, পাজিটা আমাদের কাউকেই ছাড়েনি।'

'আশ্চর্য তো! আচ্ছা, বাড়ির লোকেরা ওর সম্পর্কে কি ভাবে বল্‌তো?'

'ওরা তো বলে নাকি ভারি চমৎকার ভদ্রলোক—ভারি দয়ামায়া, ফুর্তিবাজ। বদ্ স্বভাবের মধ্যে ওই মেয়ের পেছনে ঘোরা। তা আমার কথা যদি বলো, এতে তেমন দোষ আর কি? ও সব পরে কেটে যাবে।'

লিজার নিঃশ্বাস পড়ল, 'যদি একবার ওকে দেখতে পেতাম!'

'বা, তাতে এত ভাবনা কি। আমাদের এখান থেকে তুগিলভো খুব দূর হবে না—মাত্র তিন ভার্স্ট। হাঁটতে হাঁটতে নয়তো ঘোড়ায় চেপেই চলে যাও—নিশ্চয় দেখা পাবে। প্রত্যেকদিন খুব সকালে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে সে ওই দিকে যায়।'

'উঁহু—ওতে হবে না। যদি ভাবে আমি তার পেছনে ধাওয়া করছি! তা ছাড়া, আমাদের বাপেদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়—না, কোনো রকমেই ওর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব নয়। হয়েছে। নাস্‌তিয়া শোন্, আচ্ছা, চাষী মেয়ের মতো সাজ করে যদি যাই?'

'সেই ভালো। ঘরে-বোনা ব্লাউজ পরো একটা, আর একটা সারাফান*, তারপর সোজা হেঁটে চলে যাও তুগিলভো। আমি বাজি রেখে বলছি, বেরেস্তভ তোমাকে নজর না করে পারবেই না।'

'গেঁয়ো টানে কথাও আমি চালাতে পারব খব। উঃ, নাস্‌তিয়া, নাস্‌তিয়ারে! কি চমৎকার বুদ্ধি এসে গেছে মাথায়।' অতঃপর এই চমৎকার বুদ্ধিটি হাসিল করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লিজা শুতে গেল।

পরদিন সকাল থেকেই তার কাজ শুরু হয়ে গেল—বাজারে কিনতে পাঠালে ঘরে-বোনা মোটা কাপড়, নীল রঙা ছিট, আর পেতলের বোতাম। নাস্‌তিয়ার সাহায্যে একটি ব্লাউজ আর একটি সারাফান কেটে ফেলা গেল, সবকটা চাকরানিকে সে লাগালে সেলাইয়ের কাজে আর সন্ধ্যের মধ্যে সব কিছু তৈরি হয়ে গেল। নতুন পোশাকখানা লিজা পরখ করে দেখলে। আয়নায় নিজের মূর্তির দিকে তাকিয়ে লিজা স্বীকার না করে পারল না যে এত সুশ্রী তাকে আর কিছুতে দেখায়নি। নিজের পার্টটুকু তৈরি করে রাখার জন্যে লিজা নিচু হয়ে মাথা নোয়ালে, মাটির খেলনা-বেড়ালগুলো যেমন করে মাথা নাড়ে তেমনিভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চলা ফেরা করলে, স্থানীয় গ্রাম্য টান দিয়ে কথা কইলে, হাসতে গিয়ে ব্লাউজের আস্তিন দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে হাসলে এবং নাস্‌তিয়াকে দিয়ে তার সবকিছু হাবভাব মঞ্জুর করিয়ে নিল। মুশকিল হল শুধু তার খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে। নরম পায়ের নিচে ঘাসের চাপড়াগুলো বিঁধছিল আর কাঁকর বালি পায়ে ফুটছিল অসহ্য রকম। এ ব্যাপারেও নাস্‌তিয়া তাকে বাঁচালে।

---

* সারাফান—রুশ মহিলাদের পোশাক।

লিজার পায়ের মাপ নিয়ে সে ছুটে গেল মাঠের দিকে। সেখানে রাখাল ত্রফিমকে পাকড়ে একজোড়া লাপ্তি* বানাবার হুকুম দিলে। পরদিন ভোর হবার আগেই লিজা জেগে উঠল। বাড়ির সকলে তখনো ঘুমিয়ে। ওদিকে নাস্তিয়া গিয়ে ফটকে অপেক্ষা করতে লাগল, ফটকের সামনে দিয়ে কখন রাখাল যায়। শিঙা-ধ্বনি শোনা গেল—জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে গাঁয়ের পশুপাল পেরিয়ে গেল। যাওয়ার পথে ত্রফিম্ পঞ্চাশ কোপেক দাম নিয়ে নাস্তিয়ার হাতে দিয়ে গেল একজোড়া ছোট্ট রংচঙ্গে চটি। তারপর নিঃশব্দে লিজা তার চাষী মেয়ের সাজে সেজে নিলে। মিস্ জ্যাক্সন সম্পর্কে কি করতে হবে তা নাস্তিয়ার কানে কানে জানিয়ে দিয়ে পিছ্-বারান্দা দিয়ে নেমে সবজী-বাগানের মধ্যে দিয়ে সে সোজা দৌড়ল খোলা মাঠের দিকে।

পূবদিকের আকাশ তখন ফরসা হয়ে আসছে। সারি সারি সোনালী মেঘের স্তর সূর্যের জন্যে অপেক্ষা করছে, ঠিক যেন একদল সভাসদ দাঁড়িয়ে আছে কখন জার আসে। স্বচ্ছ আকাশ, ভোর বেলাকার তাজা আবহাওয়া, শিশির, বাতাস আর পাখির কাকলী মিলে লিজার মন ভরে উঠল ছেলেমানুষী খুশিতে। পাছে চেনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলে সে যেন উড়ে যেতে চাইছিল। তার বাপের সম্পত্তির শেষ সীমানার বনভূমিটার কাছে এসে সে হাঁটায় ঢিল দিলে। এইখানেই আলেক্সেইয়ের আশায় অপেক্ষা করার কথা। বুকের মধ্যে তার ভয়ানক ঢিপঢিপ করতে শুরু করল, কেন কে জানে। কিন্তু তারুণ্যের অভিযানের মধ্যে এই বুক দুরদুরানিটুকু আছে বলেই তো তার এত আকর্ষণ। ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির ভেতরে লিজা পা বাড়ালে। বনের ভেতর

---

* লাপ্তি—গাছের ছালের বোনা জুতো।

থেকে নানা রকম যেসব চাপা শব্দ উঠছিল তা কানে যেতেই অবশ্য তার খুশির ভাবটুকু উড়ে গিয়েছিল। পরে একটু একটু করে তার মন ভরে উঠল সুখের নানা চিন্তায়। লিজা ভাবছিল··· কিন্তু এক বসন্তের দিনে ভোর পাঁচটা ছটার সময় সতেরো বছরের একটি মেয়ে বনের মধ্যে ঠিক কি যে ভাবছে তা কে-ই বা বলতে পারে। নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে লিজা যে পথ ধরে হাঁটছিল তার দুপাশ লম্বা লম্বা গাছে ঢাকা। হঠাৎ একটা চমৎকার শিকারী কুকুর ওর দিকে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। লিজা আঁতকে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন **হাঁক** দিলে—'tout beau, Sbogar, ici !'* তারপর ঝোপঝাড়গুলোর পেছন থেকে একটি শিকারী যুবক বেরিয়ে এল। লিজাকে সে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরী, আমার কুকুরটা কামড়াবে না'। ইতিমধ্যে কিন্তু লিজার ভয় কেটে গিয়েছিল, সুযোগ বুঝে সে জবাব দিলে, 'না গো বাবু ডরাইছি যে। দেখুন ক্যানে কেমন করছে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে যি।' চাষী মেয়েটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আলেক্সেই তাকিয়ে রইল (আগন্তুক লোকটি যে কে তা নিশ্চয়ই পাঠকেরা আন্দাজ করতে পেরেছেন)। তারপর বললে, 'ভয় পাচ্ছ যখন, তখন চলো তোমাকে এগিয়ে দিই। পাশাপাশি হাঁটলে আপত্তি নেই তো?' লিজা বললে, 'হাঁটলেই বা ঠেকাইছে কে বলেন। রাস্তা তো আমার একলার নয়।' 'ঘর কোথা তোমার?' 'আসছি সেই প্রিলুচিনো গাঁ হতে। ভাসিলি কর্মকারের মেয়ে বটি, ব্যাঙের-ছাতা তুলতে আলছি।' (লিজা তার ঝাঁপে বাঁধা চাঁচের

* ফরাসী ভাষায়: 'বেশ স্‌বোগার, এখানে এসো।'

ঝুড়িটা দুলিয়ে দিল)। 'তা আপুনি কে বটেন গো? তুগিলভো গাঁয়ের লয়?' 'ঠিক ধরেছো। আমি হলুম ওই গাঁয়ের বাবুর বেটার পোশাক-বরদার।' আলেক্সেই ভেবেছিল মেয়েটির সমপর্যায়ে নেমে কথা বলাই ভালো। কিন্তু লিজা তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। বললে, 'আজ্ঞা, তা লন গো। আমাকে বুঝ দিবেন সি হবে না। আপুনি বাবুরই ছেলে বটেন যি।' 'কিসে বুঝলে?' 'আপুনকার সব কুছুতেই বুঝা যাচ্ছে যে।' 'কিন্তু কি সে?' 'কেনে, কে মনিব কে চাকর তাই কি বলতে না পারা হয়? আপনকার সাজ পোশাক ভিনু, আপনকার কথাবার্তা ভিনু, আমরা যেমুন ভাবে কুকুরকে ডাক দিই আপনি তো কই, তেমন করে ডাকলে নাকো।' লিজার রূপ আলেক্সেইকে আচ্ছন্ন করতে সুরু করেছিল। সুন্দরী চাষী মেয়েদের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষা করে চলার অভ্যেস আলেক্সেইকে রাখতে হয়নি। তাই সে অনায়াসে লিজার কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু ছিটকে পেছিয়ে এসে লিজা তার মুখের মধ্যে হঠাৎ এমন একটা গম্ভীর শাসানির ভাব ফুটিয়ে তুলল যে আলেক্সেই মজা লাগলেও আর বেশি এগুতে সাহস করলে না। লিজা কড়া করে বললে, 'আপনি যদি ভবিষ্যতে আমার বন্ধু থাকতে চান তাহলে আত্মবিস্মৃত হবেন না।' 'এমন ভাষায় কথা কওয়া কার কাছে শিখলে?'—প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি তোমাদের মনিব কন্যার ঝি আমার সই নাস্‌তেন্‌কার কাছ থেকে শেখা? শিক্ষা-দীক্ষা তাহলে আজকাল চারদিকেই বেশ ছড়িয়েছে।' লিজা টের পেল তার ভাষাটা ঠিক চরিত্রানুযায়ী হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি করে তার অভিনীত ভূমিকায় ফিরে আসতে চেষ্টা করলে। বললে, 'হেই বাবু, কি বুলছেন গো। বাবুর বাড়িতে আমরা যেতে পাই না ভেবেছেন? কতো কি দেখি,

কতো কি শুনি। কিন্তু হেথাকে আপনার সাথে ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে বকবক করলে আমার ব্যাঙের-ছাতা তুলা হবে না। আপনি আপনার পথ দেখুন বাবু, আমিও আমার কাজে যাই। দণ্ডবৎ।' লিজা যাবার উপক্রম করতেই আলেক্সেই তার হাত চেপে ধরে আটকালে। 'তোমার নামটা কি সুন্দরী?' 'আমার নাম বটে আকুলিনা।' আলেক্সেইয়ের মুঠো থেকে আঙুলগুলো খসিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে লিজা বললে, 'ছেড়ে দিন বাবু, বাড়ি যাবার সময় হয়ে গেল যি।' 'তা হলে সই আকুলিনা, তোমার বাবা ভাসিলি কর্মকারের সঙ্গে আমি গিয়ে দেখা করব।' লিজা চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই বাবা গো! দোহাই আপুনার, উকাজটি করবেন নাকো। বাড়ির লুকে যদি জানতে পারে, ই বনের মধ্যে একলা একলা বাবুর সঙ্গে কথা কয়েছি তাইলে আমার হঁয়েছে। বাপ আমার পিটিয়ে হাড়মাস কালি করে ছাড়বে।' 'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে দেখা করতেই হবে।' 'ব্যাঙের-ছাতা তুলতে আমি আসব হেথাকে।' 'কিন্তু কবে?' 'তা কি বলা যায় কখুনো? কালও হতে পারে।' 'আকুলিনা, সাহস পাচ্ছি না নইলে তোমায় একটু চুমু খেতাম। কালই এসো, ঠিক এই সময়, এসো কিন্তু।' 'বেশ, আসব তাইলে।' 'ফেরাবে নাতো?' 'আসবো গো আসবো।' 'দিব্যি করে বলো।' 'এই লাও—ধরম ছুঁয়ে বলছি আসব।'

পরস্পরের কাছ থেকে ওরা বিদায় নিলে। বন থেকে বেরিয়ে এল লিজা। মাঠ পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেই সোজা ছুটল খামারবাড়ির দিকে—নাস্‌তিয়া সেখানে অপেক্ষা করছে। এখানে সে তার পোশাক পালটাতে-পালটাতে 'সখির' উৎসুক প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেল অন্যমনস্কের মতো, তারপর হাজিরা দিতে গেল ড্রয়িংরুমে। টেবিল সাজানো হয়ে গিয়েছিল,

প্রাতরাশ প্রস্তুত, এই প্রত্যুষেই মিস্ জ্যাকসন পাউডার শোভিত এবং ক্ষীণকটি পোশাকে সজ্জিত হয়ে পাঁউরুটির পাতলা চাকা কাটছিলেন। অত ভোরে লিজা বেড়াতে বেরিয়েছিল বলে লিজার বাবা তার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'ভোরে ওঠার মতো স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই'। তারপর বিলাতী পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, যারা একশ বছরেরও বেশি বেঁচেছে তারা কেউ ভদকা ছোঁয়নি আর কি-শীত কি-গ্রীষ্ম ভোরে উঠেছে। লিজার কানে কিন্তু এসব বিশেষ ঢুকছিল না। মনে মনে সে তখন তার ভোর বেলাকার অভিসারের গোটা ঘটনাটা খতিয়ে খতিয়ে দেখছিল — আকুলিনা আর শিকারী যুবকের মধ্যে যা কিছু কথা হয়েছে সব। ভাবতে গিয়ে বিবেকের একটা দংশন অনুভব করতে শুরু করেছিল সে। নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছিল তাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই শোভনতার সীমা লংঘন করেনি, তার এই তামাসা থেকে কোনো রকম বিশ্রী পরিণতি দেখা দেবে না। কিন্তু যতই যুক্তি পাওয়া যাক বিবেক কিছুতেই মানছিল না। বিশেষ করে পরদিন দেখা করবে বলে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেইটেই তাকে খোঁচাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। ধর্মের নামে দেওয়া তার পবিত্র প্রতিশ্রুতিটা লিজা শেষ পর্যন্ত ভেঙেই বসত — হঠাৎ মনে হল আলেক্সেই হয়ত অপেক্ষা করে ওকে না পেয়ে আসল আকুলিনার সন্ধানে গাঁয়ের মধ্যে চলে যাবে, তার ফলে কর্মকারের মুটকি ফুটকি-মুখী মেয়েটাকে খুঁজে পেয়ে লিজার চালাকি টের পেয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় ভয় পেয়ে সে ঠিক করলে, পরদিন আবার সে আকুলিনার বেশে বনভূমিতেই যাবে।

ওদিকে, আলেক্সেইয়ের মনের খুশিতে কিন্তু কোনো ছায়া ঘনায়নি। নতুন সখিটির কথা ছাড়া সারাদিন আর কোনো ভাবনা তার ছিল না। রাত্রে তার স্বপ্নে বার বার হানা দিয়ে গেল এক জলপাইয়ের মতো রূপসীর মূর্তি। ভোর হতে না হতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে নিলে। বন্দুকে গুলি ভরে নেবারও তর সইল না, অনুগত কুকুর স্‌বোগারকে নিয়ে সে দ্রুত পা চালালে তার প্রতিশ্রুত সাক্ষাৎ-স্থলের দিকে। আধ ঘণ্টা কাটল তার অসহ্য এক প্রতীক্ষায়। অবশেষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটি নীল সারাফান ভেসে উঠতেই সে ছুটে এগিয়ে গেল তার প্রিয়তমা আকুলিনার দিকে। লিজা তার সকৃতজ্ঞ সম্ভাষণের জবাবে হাসল বটে, কিন্তু মুখের ওপর যে বিমর্ষ উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তা আলেক্সেইয়ের দৃষ্টি এড়াল না। আলেক্সেই তার কারণ জিজ্ঞেস করলে। লিজা স্বীকার করে বললে, যে এখন তার মনে হচ্ছে তার আচরণ শোভন হয়নি, সে জন্যে তার অনুতাপ হচ্ছে। এবারেতেও সে কথার খেলাপ করতে চায়নি বটে, কিন্তু এই তাদের শেষ দেখা, লিজা মিনতি করলে যেন তাদের এ পরিচয়ের অবসান হয়—এ থেকে কোনো মঙ্গল হবার নয়। বলাই বাহুল্য এ সব কথাই সে বলেছিল গেঁয়ো বাক্‌ভঙ্গির টানে কিন্তু সরল একটি গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে ভারি অস্বাভাবিক এইসব ভাবনা দেখে আলেক্সেই খুব অবাক হয়ে গেল। ভাষার যতো জোর আছে সব দিয়ে সে আকুলিনাকে বোঝাতে শুরু করল যাতে সে তার মত বদলায়। আলেক্সেইয়ের অভিসন্ধির মধ্যে যে কোনো মালিন্য নেই তা নিশ্চয় করে সে জানালে, প্রতিজ্ঞা করলে এমন কিছুই সে করবে না যাতে আকুলিনাকে অনুতাপ করতে হয়, যে-কোনো বিষয়ে তার

প্রত্যেকটি কথাই সে মেনে চলবে, শুধু আকুলিনার সঙ্গে একলা দেখা হওয়ার আনন্দ থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়। বেশি না হলেও অন্তত একদিন বাদ একদিন, নয়ত সপ্তাহে মাত্র দুই দিন। আলেক্সেইয়ের কথার মধ্যে সত্যিকার হৃদয়াবেগের ঝঙ্কার বাজছিল এবং সেই মুহূর্তে আন্তরিকভাবেই তার মনে হল সে আকুলিনাকে ভালোবেসে ফেলেছে। লিজা চুপ করে তার কথা শুনলে। কথা শেষ হলে বললে, 'তেবে কথা দাও, গাঁয়ের মধ্যে কখুনো আমাকে খুঁজতে যাবে না, আমার লেগে কাউকে কিছু শুধোইবে না? কথা দাও, আমি নিজে যা ঠিক করে দুব, উর বেশি আমার সাথে দেখা করতে চাইবে নাকো।' আলেক্সেই বলতে গিয়েছিল, 'পবিত্র ক্রসের দিব্যি দিয়ে বলছি—' কিন্তু লিজা হেসে তাকে থামালে, 'দিব্যি দিতে হবে না গো—মুখের কথাটোই যথেষ্ট'। অতঃপর তাদের আলাপ চলল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঘুরে বেড়াল বনের মধ্যে। অবশেষে লিজা বললে, 'ইবার যেতে হবে যি'। বিদায়ের পর নিঃসঙ্গ আলেক্সেই ভেবে পেল না মাত্র দুবার দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই একটি সরল পল্লীবালা তার ওপর অমন নিঃসন্দেহ প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি করে। আকুলিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা অভিনবত্বের আকর্ষণ ছিল। আর এই বিচিত্র কৃষক-কন্যার অনুশাসনগুলো যদিও তার কাছে বেশ দুর্বিষহ বলে ঠেকছিল তবু যে কথা সে দিয়েছে তা খেলাপ করার চিন্তা তার মনে একেবারেই এল না। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অশুভ আংটি, রহস্যময় চিঠি আর মোহমুক্তির ভান সত্ত্বেও আলেক্সেই হল নেহাৎই একটি সহৃদয় আবেগপ্রবণ তরুণ, অন্তঃকরণে তার এখনো কোনো বিকার

স্পর্শ করেনি; নির্মল আনন্দের উপলক্ষ্য পেলে মেতে উঠতেও তার দেরি লাগে না।

আত্মতুষ্টি ছাড়া আর কারো মনোরঞ্জনের দায় না থাকলে আমি এবার এই তরুণ-তরুণীদের অভিসার, তাদের ক্রমবর্ধমান অনুরাগ-বিশ্বাস, তাদের ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তার বিশদ বিবরণ দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু জানি, অধিকাংশ পাঠকই আমার এ বিলাস উপভোগ করতে প্রস্তুত নন। এ সবের খুঁটিনাটি বর্ণনা তাদের কাছে নেহাৎ পান্‌সে বলেই মনে হতে বাধ্য। তাই তা বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে দুমাস না পেরতেই আমাদের আলেক্সেইয়ের অবস্থা হল একেবারে আকণ্ঠ ডুবু-ডুবু, আর কথায় অতটা প্রকাশ না করলেও লিজার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। যা চলছে তাই নিয়েই তাদের আনন্দ, ভবিষ্যতে কি হবে সে দিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না।

সাতপাক বন্ধনের কথাটাও তাদের মনে না উঠেছে এমন নয়, কিন্তু সে কথা তারা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করেনি। কেন, তা সহজেই অনুমেয়। প্রিয়তমা আকুলিনার প্রতি আলেক্সেইয়ের যত অনুরাগই থাক, একটি গরিব কৃষক মেয়ের সঙ্গে তার দূরত্ব যে কতোখানি সে কথা আলেক্সেইয়ের ভালোই জানা ছিল, আর বাপেদের মধ্যে যে রকম বৈরিতা তা জানা থাকায় লিজারও ভরসা ছিল না ভবিষ্যতে এ কলহ আদৌ মিটবে কিনা। তাছাড়া, ভেতরে ভেতরে একটা অস্পষ্ট রোমান্টিক কল্পনায় লিজার এই অহঙ্কার দানা বেঁধে উঠেছিল যে সে দেখবে তুগিলভোর উত্তরাধিকারী শেষ পর্যন্ত প্রিলুচিনো গাঁয়ের কর্মকার কন্যার পদতলে এসে দাঁড়িয়েছে। যাই

হোক, ইতিমধ্যে কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল যাতে পরস্পরের কাছে পরস্পরের প্রতিষ্ঠা প্রায় বদলাতে শুরু করল।

একদিন এক সকালের চমৎকার ঠাণ্ডায় (আমাদের রুশী শরৎকালে যা প্রায়ই দেখা যায়) ইভান পেত্রোভিচ বেরেস্তভ ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছিলেন। যদি কিছু শিকার মিলে যায় এই ভেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন পাঁচ ছটি গ্রে হাউণ্ড, একজন সহিস আর আওয়াজ করার জন্যে কিছু ভূমিদাস ছোঁড়া। একই সময়ে চমৎকার আবহাওয়া দেখে গ্রিগরি ইভানোভিচ্ মুরম্স্কিও তার ঘুড়ীটার ওপর জিন লাগাতে হুকুম দেন, এবং তার বিলাতি কায়দার সম্পত্তির ওপর দিয়ে দুলকি-চালে চালিয়ে যেতে থাকেন। এইভাবে বনভূমিটার কাছে পৌঁছতেই নজরে পড়ল তাঁর পড়শী জিনের ওপর সগর্বে খাড়া হয়ে বসে খরগোসের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গায়ে তাঁর একটা শেয়াল-লোমের লাইনিং দেওয়া জ্যাকেট। ছোঁড়াগুলো আওয়াজ করতে করতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খরগোস তাড়া দিয়ে আনছে। এ রকম একটা সাক্ষাৎ ঘটে যাবে টের পেলে গ্রিগরি ইভানোভিচ্ যে অন্য দিকে ঘোড়া চালাতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেরেস্তভের সামনাসামনি এসে পড়লেন তিনি একেবারে আচমকা—যখন টের পেলেন তখন দেখা গেল বেরেস্তভ একেবারে পিস্তল-গুলির আওতার মধ্যেই। আর কোনো উপায়ই নেই। সুতরাং ষোলো আনা শহুরে এক ইউরোপীয়ের মতো মুরম্স্কি তার শত্রুর কাছ পর্যন্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রতা করে অভিবাদন জানালেন। বেরেস্তভও অমায়িকভাবে এমন একটা প্রত্যভিবাদন দিলেন যেন একটা শেকল বাঁধা ভালুক তার মনিবের হুকুম শুনে বাবুদের সেলাম জানাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই

খরগোসটা বন থেকে লাফিয়ে পড়ে খোলা মাঠের দিকে ছুট দিল। বেরেস্তভ আর তার সহিস আপ্রাণ চিৎকারে হৈ-হৈ করে উঠে কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিলে এবং পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে খরগোসের পেছু নিল। মুরম্স্কির ঘোড়াটা কখনো শিকারে আসেনি। এ ব্যাপারে হঠাৎ চমকে গিয়ে সে ছুটতে শুরু করল। পাকা সওয়ারী বলে মুরম্স্কি নিজেকে জাহির করতেন। এই আকস্মিক ঘটনাটার ফলে একটি অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার থেকে রেহাই পাওয়া গেল ভেবে ভেতরে ভেতরে তিনি খুশি হয়ে ঘোড়াটাকে ছুটতে দিলেন তার আপন খেয়াল মতো। এদিকে সামনে ছিল একটা খাল—ঘোড়াটা তা আগে দেখতে পায়নি। ছুটতে ছুটতে খালটার সামনে এসে ঘোড়াটা হঠাৎ থমকে গেল। মুরম্স্কি টাল সামলাতে পারলেন না। শীতে জমাট মাটির ওপর মুরম্স্কি বেশ সজোরে আছাড় খেয়ে চিৎপাত দিয়ে পড়লেন আর ঘুড়ীটাকে শাপান্ত করতে লাগলেন। ঘুড়ীটা ইতিমধ্যে সওয়ারী নেই টের পাওয়া মাত্রই যেন সম্বিত পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ইভান পেত্রোভিচ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, গ্রিগরি ইভানোভিচের লেগেছে কিনা। সহিসটিও ওদিকে অপরাধীকে পাকড়াও করে এনে লাগাম ধরে দাঁড়াল। সহিসের সাহায্যে মুরম্স্কি ঘোড়ায় উঠে বসলেন আবার। বেরেস্তভ তাঁকে বাড়ি আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন—মুরম্স্কি গ্রহণ না করে পারলেন না। বেরেস্তভ এবার ফিরলেন বিজয় গর্বে—একটি খরগোস ধরেছেন এবং তাঁর আহত শত্রুকে প্রায় এক যুদ্ধবন্দীর মতো করে নিয়ে চলেছেন বাড়িতে।

প্রাতরাশের টেবিলে দুই পড়শীর মধ্যে কথাবার্তা হল চমৎকার বন্ধুর মতো। মুরম্স্কি বেরেস্তভের কাছে স্বীকার করলেন যে আছাড় খাওয়ার ফলে

ঘুড়ীটার ওপর চেপে বাড়ি ফেরা তার কুলোবে না। বেরেস্তভ যেন একখানা গাড়ি করে দেন। বেরেস্তভ তাঁকে বার-বারান্দা পর্যন্ত পোঁছিয়ে দিলেন। মুরম্স্কিও বেরেস্তভের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি না নিয়ে ছাড়লেন না যে পরদিন আলেক্সেই ইভানোভিচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে উনি মুরম্স্কির ওখানে গিয়ে শাকভাত খাবেন। দেখা গেল লেজ-বেঁড়ে এক মাদী ঘোড়া ভড়কে যাওয়ার ফলে দীর্ঘকালের এক সুগভীর শত্রুতা অবসানের লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছে।

গ্রিগরি ইভানোভিচ্‌কে দেখে লিজা ছুটে এল। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, ‘কি হয়েছে বাবা? খোঁড়াচ্ছ কেন? তোমার ঘোড়াটা কই? এটা কার গাড়ি?’ গ্রিগরি ইভানোভিচ্‌ বললেন, ‘my dear, যা হয়েছে তা ভাবতেও পারবে না’। বলে তিনি যা বললেন লিজা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্ময়ের একটা ঘোর কাটতে না কাটতেই তিনি জানালেন বেরেস্তভেরা বাপ বেটায় পরদিন আসছে ডিনারের নিমন্ত্রণে। বিবর্ণ মুখে লিজা চেঁচিয়ে উঠল, ‘সেকি! বেরেস্তভেরা বাপ বেটা ডিনারে আসছে কালকে? তুমি যা খুশি করবে করো, আমি কিন্তু ওদের সামনে যাচ্ছি না।’ লিজার বাপ বললেন, ‘পাগল হয়েছিস নাকি? হঠাৎ এত লজ্জা কেন বাপু? নাকি নভেলে-পড়া নায়িকাদের মতো বংশগত একটা ঘেন্না দেখাবার শখ হয়েছে? ও সব ছেলেমানুষী রাখ··· ‘না বাবা, বেরেস্তভদের সামনে আমি কিছুতেই বেরুতে পারব না, দুনিয়া দিলেও না।’ গ্রিগরি ইভানোভিচ্‌ ভালো করেই জানতেন, মেয়ের কথায় আপত্তি করে কিছুই লাভ হবে না। তর্ক করা ছেড়ে তিনি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে এবম্বিধ এক স্মরণীয় অশ্বারোহণের পরে চলে গেলেন বিশ্রাম নিতে।

লিজাভেতা গ্রিগরিয়েভনা নিজের ঘরে এসে নাস্‌তিয়াকে ডেকে আনলে। পরদিনকার নিমন্ত্রণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলল দুজনের মধ্যে। সযত্ন-লালিত এক তরুণী মহিলার মধ্যে তার আকুলিনাকে আবিষ্কার করে কি ভাববে আলেক্সেই? লিজার স্বভাব চরিত্র, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধি বিবেচনা সম্পর্কে কি ধারণা হবে তার? অথচ এমনভাবে আকস্মিক দেখা হয়ে গেলে ওই-বা কি করে তা দেখার জন্যেও লিজার লোভ কম ছিল না··· হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তৎক্ষণাৎ সেটি নাস্‌তিয়াকে জ্ঞাপন করে দেওয়া হল। দুজনেই উৎফুল্ল হয়ে যেমন করে হোক তা কাজে পরিণত করবে বলে স্থির করে ফেললে।

পরদিন প্রাতরাশের সময় গ্রিগরি ইভানোভিচ্‌ মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন, বেরেস্তভদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকার কথা সে তখনো ভাবছে কিনা। লিজা বললে, ‘তোমার যখন এত ইচ্ছে তখন না হয় ওঁদের অভ্যর্থনাই করব, কিন্তু একটি শর্ত আছে বাবা। ওদের সামনে আমি যে পোশাক পরেই আসি না কেন আর যাই করি না কেন তুমি বকতে পাবে না, অসন্তুষ্ট হতে পাবে না, অবাক হতে পাবে না।’ গ্রিগরি ইভানোভিচ হাসতে হাসতে বললেন, ‘আবার কোনো একটা ফাজলামির মতলবে আছো বুঝি? বেশ রাজী। কাজল-চোখী পাগলী আমার, করো, যা খেয়াল হচ্ছে।’ গ্রিগরি ইভানোভিচ্‌ এই বলে তার কপালে একটি চুমু এঁকে দিলেন। লিজাও ছুটল তার যোগাড়-যন্ত্র করতে।

কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় ছয়-ঘোড়ায় টানা এক ঘরে-বানানো গাড়ি এসে ঢুকল উঠোনে, ঝকঝকে সবুজ ঘাসের চক্করটুকু পেরিয়ে। মুরম্‌স্কির দুজন সাজগোজ-করা বরকন্দাজের সাহায্যে বেরেস্তভ-কর্তা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন

বারান্দায়। ছেলে এল পেছনে পেছনে ঘোড়ায় চেপে, তারপর বাপের সঙ্গে খাবার ঘরে গেল একত্রে। টেবিল তৈরিই ছিল। মুরম্‌স্কি তাঁর অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন আন্তরিকতার সঙ্গে, ডিনারের আগে তাঁর আবাদী বাগান আর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সব পরিদর্শনের জন্যে নেমন্তন্ন করলেন, এবং সবাইকে নিয়ে হেঁটে গেলেন তাঁর কাঁকর-বিছানো ঝাড়ু-দেওয়া পথের ওপর দিয়ে। অকেজো খেয়ালের পেছনে সময় আর মেহনত খরচ করতে হয়েছে দেখে বেরেস্তভ-কর্তা ভেতরে ভেতরে বিরক্ত বোধ করছিলেন বটে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললেন না। তাঁর পুত্রের মন অবশ্য এ দুয়ের কোনোটাতেই ছিল না— কৃপণ জমিদারটির মতো সে না হচ্ছিল ব্যাজার, না অনুভব করছিল আত্মতুষ্ট বিলেত-নবীশের মতো উৎসাহ। মন তার ছিল শুধু কখন গৃহস্বামীর কন্যার আবির্ভাব ঘটে সেই দিকে। মেয়েটি সম্পর্কে অনেক কথা সে আগেই শুনেছে এবং যদিও আমরা জানি যে তার হৃদয়াবেগ অন্যত্র নিবদ্ধ তবু একটি সুন্দরী তরুণী নারী যে তার কল্পনাকে নাড়া দিতে বাধ্য তাতে সন্দেহ কি।

ফিরে এসে তিনজন বসলেন ড্রইংরুমে। বৃদ্ধ দুজন সেকালের কথাবার্তা শুরু করলেন, সামরিক জীবনের গল্প শোনালেন পরস্পরকে। আর আলেক্সেই ভাবতে লাগল, লিজা এলে সে কি ভূমিকা নেবে। ঠিক করল একটা উগ্র নিস্পৃহতার চাল বজায় রাখাই সবচেয়ে ভালো হবে এবং সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে লাগল। তারপর দরজা খুলে গেল। এমন একটা তাচ্ছিল্য আর সবিশেষ বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে আলেক্সেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যাতে সবচেয়ে ঝানু বিলাসিনীর বুকও দুরদুর করে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত যে এল সে লিজা নয়, সর্বাঙ্গ পাউডারে আচ্ছন্ন, করসেট-আঁটা মিস্ জ্যাকসন। নিচের দিকে তাকিয়ে

অভিবাদন করে সে ঘরে ঢুকল, ফলে আলেক্সেইয়ের মহতী সামরিক মহড়াটা একেবারে মাঠে মারা গেল। ধাক্কা থেকে সামলে ওঠার সময় পেতে না পেতেই আবার দরজা খুলে গেল এবং এবার ঘরে ঢুকল লিজা। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। মুরম্স্কি তার অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে ঠোঁট কামড়ালেন··· লিজা, তাঁরই রং-ময়লা মেয়ে লিজা একেবারে আকর্ণ প্রলেপে পাউডার মেখে যেন মিস্ জ্যাকসনকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে, তার চুলের রঙের তুলনায় ভয়ানক হালকা রঙের নকল চিকুর যা দুলছে তা একেবারে ফরাসী লুই কোয়াতোর্জ-এর পরচুলার মতো কোঁকড়ানো। মাদাম্ পম্পাদুরের কুঁচিদার পেটিকোটের মতো আস্তিন ঝুলছে আলিম্বেসাইল* ফ্যাশনের। সর্বাঙ্গে লেসের বাঁধন পড়েছে এমন ভাবে যে তার দেহখানা হয়েছে ইংরেজী এক্স্-এর মতো এবং তার মায়ের যেসব হীরের গয়না এখনো বাঁধা পড়েনি তা ঝিলিক দিচ্ছে লিজার আঙুলে, গলায়, কানে। ঝকমকে এবং হাস্যকর এই নারীমূর্তির মধ্যে তার আকুলিনাকে চিনতে পারা আলেক্সেইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লিজার হস্ত-চুম্বনের জন্য আলেক্সেইয়ের বাপ উঠে দাঁড়ালেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলেক্সেইকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হল। লিজার সুচারু আঙুলের ওপর ঠোঁট ছোঁয়াবার সময় আলেক্সেইয়ের মনে হল আঙুলগুলো বুঝি একটু কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তেই তার চোখ পড়ল ছোট একটি পায়ের ওপর, অতিরিক্ত রকমের বিলাসী জুতোজোড়া দেখাবার জন্যেই তা একটু এগিয়ে এসেছে বোঝা যায়। অতঃপর তার বাদবাকি সাজপোশাকটুকু আলেক্সেইয়ের চোখে খানিকটা সয়ে এল। পাউডার আর পেণ্টের ব্যাপারটা তো সে প্রথম

বোকার মতো (ফরাসী)

দিকে সরলতাবশে নজরই করেনি, আর পরেও ওগুলো যে পাউডার আর পেণ্ট সে রকম সন্দেহই তার হয়নি। গ্রিগরি ইভানোভিচ্ তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে চেষ্টা করলেন যাতে তিনি অবাক হয়েছেন তা না বোঝা যায়। মেয়ের এই খেয়ালে তাঁর এত মজা লেগেছিল যে হাসি চেপে রাখা তাঁর দায় হয়েছিল। কিন্তু দাম্ভিক ইংরেজ মহিলাটির পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ হাসির বলে মনে হয়নি। মিস্ জ্যাকসনের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে ঐ পেণ্ট আর পাউডার তারই ড্রেসিং-টেবিল থেকে মেরে দেওয়া হয়েছে। মিস্ জ্যাকসনের মুখের কৃত্রিম বিবর্ণতা ভেদ করে গাল দুটো লাল হয়ে উঠল বিরক্তিতে। তরুণী অপরাধিনীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও কিন্তু অপরাধিনীটি সে সব নজরেই আনলে না। কৈফিয়তের যা কিছু ভাবনা সব মুলতুবী রেখে দিলে ভবিষ্যতের জন্যে।

টেবিল ঘিরে সকলে বসল। অন্যমনস্ক বিষণ্ণ একটি মানুষের ভূমিকা চালিয়ে গেল আলেক্সেই। লিজা নেকীর মতো হাসলে দাঁত চেপে এবং সুরেলা গলায় কথা কইলে কেবলমাত্র ফরাসী ভাষায়। লিজার উদ্দেশ্য কি না বুঝলেও লিজার বাপের কাছে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হল। বার বার করে তিনি লিজার দিকে চাইতে লাগলেন। ইংরেজ মহিলাটি ক্রোধে নির্বাক হয়ে রইলেন। আর স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন শুধু ইভান পেত্রোভিচ্, একাই তিনি দুজনের খাওয়া খেলেন, যথারীতি মদ টানলেন পেটপুরে, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন হা-হা করে এবং উত্তরোত্তর প্রীতিভরে আলাপে জমলেন।

অবশেষে টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় এল। অতিথিরা বিদায় নিয়ে গেলেন। আর এতক্ষণ পরে প্রাণখুলে হাসার সময় পেলেন গ্রিগরি ইভানোভিচ্। লিজাকে



জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের এমন বোকা বানালি কেন বলতো? তা যাই বলিস, পাউডার দিলে তোকে মানায় কিন্তু। মেয়েদের প্রসাধনের ব্যাপারটা আমি অবিশ্যি ভালো বুঝি না, তবে আমি হলে পাউডার দেওয়া শুরু করতাম। খুব গাদা খানিক করে নয় বটে, অল্প অল্প।' মতলব তার এমন হাসিল হল দেখে লিজার খুশির সীমা ছিল না। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে বললে, এ পরামর্শটা সে ভেবে দেখবে। তারপর ছুটে গেল ক্রুদ্ধ মিস্ জ্যাকসনকে শান্ত করতে। অতি কষ্টে মিস্ জ্যাকসনকে দরজা খুলতে এবং লিজার কথা শুনতে রাজী করানো গেল। লিজা বললে, আগন্তুকদের সামনে নিজের ময়লা রং নিয়ে যেতে ওর ভারি লজ্জা করছিল। চেয়ে নেবার সাহস হয়নি তার··· ভেবেছিল মিস্ জ্যাকসন যেরকম ভালোমানুষ নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবে।··· ইত্যাদি ইত্যাদি। মিস্ জ্যাকসন যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে তাকে ব্যঙ্গ করা লিজার উদ্দেশ্য ছিল না, তখন শান্ত হয়ে চুমু খেলেন এবং ভাব হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে মুখে মাখার বিলাতি শাদা পেণ্টের একটা কৌটো উপহার দিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ ভাব ফুটিয়ে লিজা তা গ্রহণ করলে।

পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারছেন, যে পরদিন অভিসার স্থলটিতে দর্শন দিতে লিজা ভোলেনি। আলেক্সেইকে দেখা মাত্র সে বললে, 'তোমরা কাল আমাদের বাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন গেইছিলে, লয়? তা বাবুর মেয়েকে দেখে কিরকম লাগল?' আলেক্সেই বললে সে তার দিকে বিশেষ নজর করেনি। লিজা অবাক হয়ে বললে, 'হেই মাগো।' আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে 'কেন?' 'ভেবেছিলাম তুমাকে শুধাইবো, লুকে যা বলে তা সত্যি কিনা···' 'কি বলে লোকে?' 'এইটো সত্যি কিনা··· কি? লুকে যে বলে যে··· আমাকে দেখতে অনেকটা

বাবুর মেয়ের পারা?' 'দুর দুর! তোমার তুলনায় ও একটা পেত্নী।' 'না গো বাবু, উকথাটি বলো না। আমাদের বাবুর মেয়েটি কতো গোরা, কতো সুন্দরী! তার সাথে আমার তুলনা!' আলেক্সেই দিব্যি দিয়ে জানাল যে দুনিয়ার সমস্ত যুবতী ভদ্রমহিলার চেয়েও সে দেখতে ভালো এবং এ বিষয়ে তার আশঙ্কা একেবারে নিরসনের জন্যে বাবুর বাড়ির মেয়ের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিতে শুরু করলে যে লিজা হাসলে প্রাণখুলে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তা যাই বলো কেনে, আমাদের বাবুর মেয়েকে দেখে হাসি লাগুক কি যাই হোক, উর কাছে আমি একটা গোমুখ্খু তো বটি—লেখাপড়া শিখিনিক'। আলেক্সেই বললে, 'ওহো এইজন্যে ভাবনা? বেশ, তুমি যদি চাও তো এই মুহূর্ত থেকেই আমি তোমাকে পড়াতে শুরু করব।' লিজা বললে, 'তা মন্দ লয়, চেষ্টা করে দেখতে কি? এঁ্যা?' 'চেষ্টা করে দ্যাখোইনা। এখন থেকেই শুরু করি'— ওরা তক্ষুণি বসে গেল। আলেক্সেই তার পকেট থেকে একটা পেনসিল আর নোটবই বার করলে। এবং অতি চট্‌পট্‌ আকুলিনা তার বর্ণমালা শিখে ফেললে। এ রকম ত্বরিৎ-বুদ্ধি দেখে আলেক্সেই একেবারে অবাক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আকুলিনা বললে সে এবার হস্তাক্ষর শুরু করবে। প্রথম প্রথম পেনসিলটা ঠিক বাগ মানছিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল, সে তোফা লিখতে শিখে গেছে। আলেক্সেই বললে, 'আশ্চর্য তো! লাঙ্কাস্টার প্রথা মতো যতো তাড়াতাড়ি শেখা যায়, আমরা তার চেয়েও বেশি এগিয়ে যাচ্ছি।' বলতে কি, তৃতীয় দিনেই আকুলিনা বানান করে করে 'বয়ার-কন্যা নাতালিয়া' নামক উপন্যাসটি পড়তে শুরু করে দিলে

এবং পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে এমন সব মন্তব্য করলে যাতে আলেক্সেই একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল, আর মাঝে মাঝে থেমে উপন্যাসটি থেকে সংগ্রহ করা অলঙ্কার বাক্য লিখে লিখে কাগজ ভরে ফেললে।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ওরা চিঠি বিনিময় শুরু করলে। পোস্ট আপিস হল প্রাচীন ওক গাছের একটা ফোকর। ডাকপিয়নের কাজটা নাস্‌তিয়াই চালাতে লাগল লুকিয়ে লুকিয়ে। ওক গাছটার কাছে আলেক্সেই পৌঁছে দিত গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠি, আর নিয়ে আসত শস্তা নীল কাগজের ওপর আঁকাবাঁকা করে লেখা প্রিয়তমার লিপি। আকুলিনার স্টাইল প্রতি-চিঠিতেই ধাপে ধাপে উন্নত হতে শুরু করল এবং স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল তার মনটা গড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে ইভান পেত্রোভিচ্ বেরেস্তভ আর গ্রিগরি ইভানোভিচ্ মুরম্‌স্কির মধ্যে দীর্ঘদিন বাদে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তা উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে অচিরেই বন্ধুতায় পর্যবসিত হল। তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় এই পরিস্থিতিটিকে: মুরম্‌স্কি প্রায়ই ভাবতেন যে ইভান পেত্রোভিচের মৃত্যুর পর তার সবকিছু সম্পত্তি পাবে আলেক্সেই ইভানোভিচ্, ফলে প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে ধনী সম্পত্তি মালিকদের একজন বলে সে গণ্য হবে। অতএব লিজাকে বিয়ে না করার কোনো কারণ তার থাকতে পারে না। অন্যদিকে বুড়ো বেরেস্তভও একথা স্বীকার না করে পারলেন না যে যদিও তার পড়শীর মধ্যে কিছু কিছু খেয়ালীপনা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন (বেরেস্তভের কথা অনুসারে, যা কিছু বিলাতী তার জন্যে পাগল হয়ে ওঠা), তবু, তাঁর মধ্যে চমৎকার নানা গুণও রয়েছে, যেমন মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বার

করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাছাড়া গ্রিগরি ইভানোভিচ্ হলেন প্রতিপত্তিশালী খ্যাতনামা কাউণ্ট প্রন্স্কির এক নিকট আত্মীয়। এই কাউণ্টের সাহায্য আলেক্সেইয়ের কাজে লাগতে পারে এবং অন্যদিকে ভালোভাবে মেয়ের একটা বিয়ে দেওয়ার সুযোগ মুরম্স্কিও (ইভান পেত্রোভিচ্ ভাবলেন) খুশি হয়েই নেবেন। দুই বৃদ্ধ কিছুদিন তাদের মনের চিন্তা মনেই চেপে রেখেছিলেন তারপর একদিন তাঁরা তাঁদের মানসিক ইচ্ছা পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন এবং পরস্পরকে কথা দিলেন যে এ নিয়ে তাঁরা গভীরভাবে ভাববেন। দুজনেই এগুতে শুরু করলেন নিজের নিজের পথে। মুরম্স্কির পক্ষে একটা মুশকিল দাঁড়াচ্ছিল কি করে তাঁর বেট্সি ও আলেক্সেইকে একত্র করা যায়। সেই অবিস্মরণীয় ডিনারের পর থেকে এ মেয়ে আলেক্সেইয়ের সঙ্গে আর দেখাই করেনি। মনে হয় যেন ওদের মধ্যে তেমন কোনো টান নেই। যে কারণেই হোক, আলেক্সেই প্রিলুচিনোতে তারপর আর আসেনি এবং ইভান পেত্রোভিচ্ যতবার এ বাড়িতে এসেছেন, ততবারই লিজা গিয়ে তার কুঠরিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গ্রিগরি ইভানোভিচ্ ভাবলেন, আলেক্সেই যদি এখানে দৈনিক আসা যাওয়া করে তাহলে বেট্সি তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে বাধ্য, এই-ই নিয়ম—সময়ে সবকিছুই শুধরে যাবে।

ইভান পেত্রোভিচ্ কিন্তু তাঁর নিজের পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সেইদিন সন্ধ্যাতেই তিনি ছেলেকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন। পাইপ ধরিয়ে কিছুটা থেমে বললেন, ‘আলিয়োশা পল্টনে যাবার কথা আজকাল তোমার মুখে বড়ো একটা শুনি না কেন বলো



তো? ঘোড়সওয়ার সৈন্যের পোশাক পরার লোভ তাহলে তোমার আর নেই তো?' সসম্মানে আলেক্সেই জবাব দিলে, 'আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। দেখলাম আমি ঘোড়সওয়ার পল্টনে যাবো এটা আপনার পছন্দ নয়। সেক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছা মেনে চলাই তো আমার কর্তব্য।' 'ভালো কথা। তুমি তাহলে কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, আমার পক্ষে এ খুব সুখের কথা। তবে তোমার ওপর জোর করার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই। আপাতত সরকারী চাকরিতে জোর করে তোমাকে ঢোকাতে চাই না। ইতিমধ্যে তুমি বিয়ে করো এই আমার ইচ্ছা।'

অবাক হয়ে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে, 'কার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছেন?'

'লিজাভেতা গ্রিগরিয়েভনা মুরম্স্কাইয়া'—ইভান পেত্রোভিচ জানালেন, 'আমার মতে তো কনেটি মন্দ নয়।'

'আজ্ঞে, আমি কিন্তু এখনো বিয়ের কথা ভাবছিলাম না।'

'তুমি ভাবোনি বলেই তো আমাকে ভাবতে হল এবং আমি আমার মত ঠিক করে ফেলেছি।'

'আজ্ঞে, লিজা মুরম্স্কাইয়াকে ঠিক আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'পরে পছন্দ হবে। অভ্যেস হয়ে গেলেই ভালোবাসা আপনি আসবে।'

'ওকে আমি সুখী করতে পারব এমন মনে হচ্ছে না।'

'ওর সুখ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এই কি একটা কথা? পিতৃ-ইচ্ছা মান্য করার এই কি তোমার নমুনা? ছি।'

'আজ্ঞে আপনি যাই ভাবুন, বিয়ে করার আমার ইচ্ছে নেই, বিয়ে আমি করব না।'

'হয় তুমি বিয়ে করবে, নয় তুমি চুলোয় যাবে, ভগবান সাক্ষী, আমি আমার সম্পত্তি বিক্রি করে দাম যা পাবো সব উড়িয়ে যাবো, একটা কোপেকও তোমায় দিয়ে যাবো না। তিনদিন সময় দিলাম ভেবে দেখতে, ততদিন তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না।'

আলেক্সেই জানত, বাপের মাথায় যদি একটা কিছু ঢোকে তো তা নড়চড় করার কোনো উপায় নেই, তারাস স্কতিনিন [১৪] যা বলেছিলেন সেরকম 'পেরেকে ঠুকেও' না। কিন্তু আলেক্সেইও বাপের স্বভাবই পেয়েছিল এবং তার মত বদলানোও সমান কঠিন। ঘরে গিয়ে সে পৈতৃক কর্তৃত্বের সীমানা কতোটা তাই ভাবলে বসে বসে, লিজাভেতা গ্রিগরিয়েভনার মূর্তি কল্পনা করলে, ওকে ভিখিরি করে যাবে বাপের এই হুমকি সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং অবশেষে সব চিন্তা এসে নিবদ্ধ হল আকুলিনার ওপর। এই প্রথম তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সে আকুলিনাকে ভালোবেসেছে গভীরভাবে। একটা রোমান্টিক কল্পনা তাকে পেয়ে বসল: চাষীঘরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিজের মেহনতে নিজেরা বাঁচা। যতই সে ভাবলে ততই যুক্তিযুক্ত বলে কথাটা তার মনে হতে লাগল। বর্ষার জন্যে কিছুদিন থেকে অভিসার বন্ধ হয়ে ছিল। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে এবং আবেগপূর্ণ স্টাইলে সে একটা চিঠি লিখলে আকুলিনার জন্যে। তাদের সুখের পথে কি আসন্ন বিপদ ঘনিয়েছে তা জানিয়ে সে আকুলিনার পাণি-প্রার্থনা করলে।

তারপর কালবিলম্ব না করে ওক গাছের ফোকরে চিঠিটি রেখে এসে শান্ত মনে ঘুমতে গেল আলেক্সেই।

পরদিন দৃঢ়চিত্ত নিয়ে আলেক্সেই ভোরে উঠে চলে গেল মুরম্স্কির সঙ্গে দেখা করে সবকিছু খোলাখুলি তাকে জানাতে। আলেক্সেই ভেবেছিল মুরম্স্কির মধ্যে সে উদারতা জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং তাকে স্বপক্ষে পাবে। প্রিলুচিনো জমিদার-বাড়ির বারান্দার সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, 'গ্রিগরি ইভানোভিচ্ বাড়ি আছেন কি?' চাকর জানালে, 'না মশায়, গ্রিগরি ইভানোভিচ্ সকালেই বেরিয়ে গেছেন'। 'কি মুশকিল!' আলেক্সেই ভাবলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, লিজাভেতা গ্রিগরিয়েভনা বাড়ি আছেন?' 'হ্যাঁ, আছেন।' আলেক্সেই লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে, লাগামটা চাকরের হাতে দিয়ে খবর পাঠাবার জন্যে অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে গেল।

ড্রয়িংরুমের দিকে যেতে যেতে সে ভাবলে, 'বাঁচা গেছে, মেয়েটির সঙ্গেই সরাসরি কথা বলে নেওয়া যাবে'। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বজ্রাহত হয়ে দাঁড়াল। লিজা··· না আকুলিনা, জলপাই রং-এর প্রিয়তমা আকুলিনা জানলায় বসে-বসে তারই চিঠি পড়ছে। গায়ে তার সারাফানের বদলে একটা সাদা রং-এর মর্নিং গাউন। লিজা এতই তন্ময় হয়ে ছিল যে আলেক্সেইয়ের আসা টের পায়নি। উল্লাসের শব্দটা আর আলেক্সেই চেপে রাখতে পারল না। চমকে উঠে লিজা মাথা তুললে তারপর চেঁচিয়ে উঠে ছুট দিলে। আলেক্সেই জোর করে তাকে আটকালে, 'আকুলিনা! আকুলিনা!' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফরাসী ভাষায় লিজা চ্যাঁচাতে লাগল, 'mais

laissez moi donc, monsieur; mais êtes-vous' fou?'* আর আলেক্সেই বারবার বলতে লাগল, 'আকুলিনা, আকুলিনা, প্রিয়তমা আমার—আর লিজার হাত ভরে দিল চুমুতে চুমুতে। ব্যাপারটার সাক্ষী হয়ে ছিলেন শুধু মিস্ জ্যাকসন—কি হল তা ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। এমন সময় দরজা খুলে গ্রিগরি ইভানোভিচ্ ঢুকলেন; বললেন, 'ও হো! দেখছি তোমরা নিজেরাই গুছিয়ে এনেছো…

এ গল্পের শেষটুকু লেখার অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব থেকে পাঠকেরা আমায় অব্যাহতি দিন।

ই• প• বেলকিনের গল্পগুলি শেষ হল।

---

* ফরাসী ভাষায়—ছেড়ে দিন মঁসিয়ে, আপনার কি মাথা খারাপ হল? ছাড়ুন!

টীকা

[১] ১৮শ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ নাট্যকার ও সাংবাদিক দেনিস্ ফনভিজিন-এর মিলনান্ত নাটক, ১৭৮২ সালে প্রকাশিত।

[২] পুশ্‌কিনের সুহৃৎ এভ্‌গেনি বারাতিন্‌স্কির 'নৃত্য'।

[৩] ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সশস্ত্র বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন বেস্‌তুজেভ্‌-মারলিন্‌স্কি। এটি তাঁরই লেখা একটি গল্প। জার আমলের কড়া সেন্সর-ব্যবস্থার দাপটে পুশ্‌কিনকে লেখকের নামটি বাদ দিতে হয়েছে। এঁর লেখা উদ্ধৃত করে পুশ্‌কিন অবশ্য প্রকারান্তরে 'ডিসেম্বর-বিদ্রোহে' তাঁর নিজের সমর্থনের কথাই পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন।

[৪] পুশ্‌কিনের বন্ধু কবি দেনিস্ দাভিদভ সামরিক বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে লিখতেন। ১৮১২ সালে তিনি একটি পার্টিজান ফৌজের নেতৃত্ব করেছিলেন। চাষী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে ফৌজটি ফরাসী আক্রমণকারীদের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। দেনিস্ দাভিদভের কবিতায়

১৮১২ সালের দেশপ্রেমিক-যুদ্ধের একজন অংশগ্রাহী হিসেবে বুর্তসোভের নামের বারংবার উল্লেখ আছে।

[৫] প্রথম সংস্করণে আরো রয়েছে:

অবশেষে ঠিক করলাম যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শুতে যাবো, আর যতো দেরি করে সম্ভব সান্ধ্যভোজন করব, এইভাবে সন্ধ্যাগুলোকে ছোট করে ফেললাম আর দিনটাকে দিলাম বাড়িয়ে। ভাবলাম এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারত না আমার দ্বারা।

[৬] একজন রুশ সেনাপতি। ১৮২০ সালে তুর্কী হামলাদারদের হাত থেকে গ্রীসকে মুক্ত করবার জন্যে যে গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়া হয়েছিল তারই একজন নেতা ছিলেন ইনি। ১৮২১ সালের ২৯শে জুন প্রুৎ নদীর ধারে স্কুলিয়ানি গ্রামে তুর্কী বাহিনীর হাতে ইপ্‌সিলান্তির ফৌজটির পরাজয় ঘটে।

[৭] রুশ কবি ও অনুবাদক ভাসিলি জুকোভ্‌স্কির (১৭৮৩-১৮৫২) পল্লীগাথা 'স্‌ভেৎলানা' থেকে।

[৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ নাট্যকার, কবি ও কূটনীতিবিদ আলেক্‌জান্দ্র গ্রিবোয়েদভের বিখ্যাত কমেডি 'চালাকীর ফ্যাসাদ' থেকে। পুশ্‌কিনের সমকালীন লেখকের এই নাটকটি পুশ্‌কিনের নিজস্ব বিপ্লবী কাব্যের মতোই 'ডিসেম্বর-বিদ্রোহ' যুগের সেরা রচনাগুলোর সমগোত্রীয়।

[৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ কবি গাভ্রিল দের্জাভিনের 'ঝরণা' কবিতা থেকে।

[১০] 'আন্তোনি পগোরেলস্কি' ছদ্মনামে ১৯শ শতাব্দীর লেখক আলেক্সেই পেরভ্স্কির একটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১১] ১৯শ শতাব্দীর কবি পিওতর ভিয়াজেম্‌স্কির 'ডাক-স্টেশন' কবিতা।

[১২] ১৮শ শতাব্দীর রুশ কবি ইভান দ্‌মিত্রিয়েভের 'ব্যঙ্গ' কবিতার একটি ঘর-মজুর চরিত্র—তেরেন্তিচ্।

[১৩] ১৮শ শতাব্দীর কবি ইপ্‌পলিৎ বোগদানোভিচের কবিতা 'প্রিয়া'।

[১৪] ফনভিজিনের কমেডি 'বয়স্ক নাবালক'এর একটি চরিত্র; গোমূর্খ আর চাষাড়ে ধরণের জমিদার ও ভূমিদাস-মালিকের বিশেষ ধরণের চরিত্র।